ভাঙড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

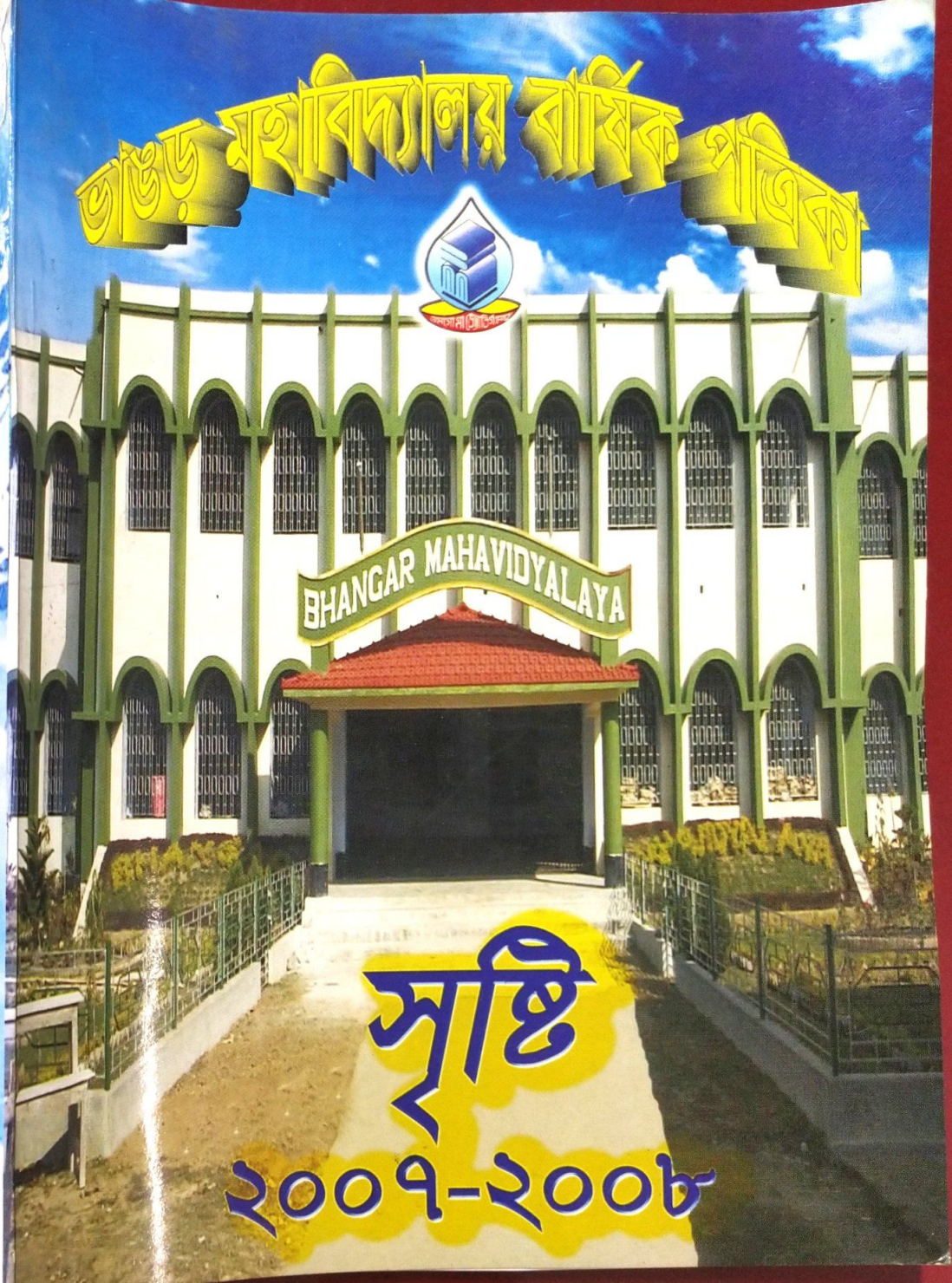

সৃষ্টি

২০০৭-২০০৮

A cultural programme by the Students' Union

Nabin Baron-Organised by the Students' Union

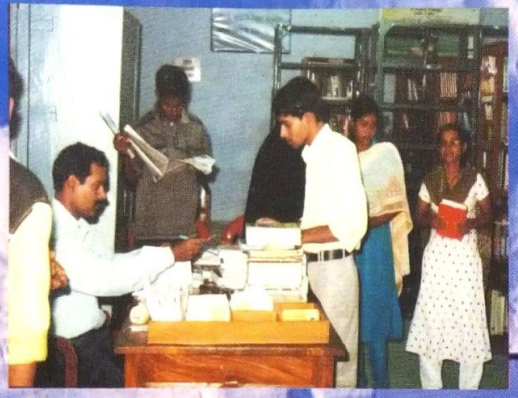

The college library (librarian lending out books)

The NCC wing of the college with NCC - Teacher-in charge

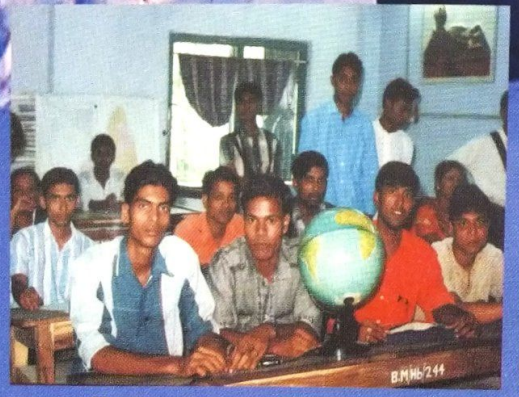

The Geography department in the lab.

Non-teaching staff along with students

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

Bhangar Mahavidyalaya Annual College Magazine

সৃষ্টি

SRISTI

"বিষয়ী লোক বিষয় খুঁজিয়া মরে। লেখা দেখিলেই বলে বিষয়টা কি ? কিন্তু লিখিতে হইলে যে বিষয় চাই-ই এমনি কোনো কথা নাই। বিষয় থাকে তো থাক, না, থাকেতো নাই থাক, সাহিত্যের তাহাতে কিছু আসে যায় না।"

রবীন্দ্রনাথ–

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সৃষ্টি

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

SRISTI

BHANGAR MAHAVIDYALAYA
ANNUAL COLLEGE MAGAZINE

প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০৭-০৮

সভাপতি : ড: ননী গোপাল বারিক
অধ্যক্ষ, ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

সম্পাদকমন্ডলী : অধ্যাপক ড: নিরুপম আচার্য (বাংলা বিভাগ)
অধ্যাপিকা মধুমিতা মজুমদার (ইংরাজী বিভাগ)
অধ্যাপক অভিজিৎ ভট্টাচার্য (ইংরাজী বিভাগ)
উম্মে সালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : মোঃ কুদ্দুস আলি ও সম্পাদক মন্ডলী

প্রকাশনা : ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়
ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মুদ্রক : *রাজ প্রিন্টার্স*
ভাঙ্গড় বিজয়গঞ্জ বাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা,
✆ : ৯৭৩২৬৬২০৫৪

FROM THE PRINCIPAL'S DESK

Shristi is a Bengali word which has vast sense of aesthetical interpretation. It is the Universe; It is the power of imagination; It is eternal. We, all come out systematically through a Process from it. Our college "Bhangar Mahavidyalaya" is the one of the Organs of it. At the moment I feel a great pleasure to utter the word again- "Shristi"- which is going to be published as a reflection our knowledge, Spirit and inspriation from our esteemed college. I hope it will be too popular in the society. I request all of you to go through "Shristi" to inspire and bless your budding ward, one who is going to be blooming as writer, Poet or similar like that.

I, again, take a little time to say that I express my heartiest love and gratitude to those teaching, non teaching and students who have actively participated to unveil 'Sristi' as 5th edition in time.

I extend a hearty welcome to those who could not participate today but it is expected tomorrow.

DR. NANIGOPAL BARIK
Principal
Bhangar Mahavidyalaya

পত্রিকা সম্পাদকের কলম থেকে

"হৃদয় আমার প্রকাশ হল
অনন্ত আকাশে-" 'গীতাঞ্জলি' –রবীন্দ্রনাথ

হৃদয়ের প্রকাশ ঘটাবার লক্ষ্যেই মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা 'সৃষ্টি'র সৃষ্টি। সেই অনন্ত আকাশে-বাতাসে সপ্তসুরের মূর্চ্ছনা আমরা শুনতে পাবো বলেই 'কান পেতে রই'। আর কবির ভাষায় বলতে চাই–

এস বন্ধু তোমরা সবে
এক সাথে সব বাহির হবে,
আজকে যাত্রা করব মোরা
অমানিতের ঘরে
নিন্দা পরব ভূষণ করে
কাঁটার কণ্ঠ হার,
মাথায় করে তুলে লব
অপমানের ভার।
দুঃখীর শেষ আলয় যেথা
সেই ধুলাতে লুটাই মাথা,
ত্যাগের শূন্য পাত্রটি নিই
আনন্দরস ভরে।

সহ সাধারণ সম্পাদকের কলম

'সৃষ্টি' নব কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে। এবার বহু ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা জমা দিয়েছে। সকলের লেখা হয়তো বেরোবেনা, কিন্তু চেষ্টা আমাদের করতে হবে। আর কে বলতে পারে, আগামী দিনে আজকের এই ব্যর্থতাই সাফল্যের মুখ দেখাবেনা ?

সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

ওয়াসিম হাবিব মল্লিক
সহঃ সাধারণ সম্পাদক
ছাত্র সংসদ

ছাত্র প্রতিনিধি

১৯৯৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ভাঙ্গড় ও ভাঙ্গড়ের তৎসংলগ্ন মানুষের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে ভাঙ্গড়ের মানুষের একান্ত আশার প্রদীপ "ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়"। বয়োঃ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক চাহিদা পূরনের পাশাপাশি NAAC এর অনুমোদন লাভ করেছে। মহাবিদ্যালয়ের সম্মুখে দু'টি কানন মহাবিদ্যালয়ের শোভা বৃদ্ধি করেছে।

বিগত ২০০১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় "সৃষ্টি" পত্রিকা। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আরো বেশী সৃজনী শক্তি বিকাশের জন্যে "সৃষ্টি" পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

আমাদের মূল উদ্দেশ্য হবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্টের পথে অগ্রসর হয় সেই সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলা।

সবশেষে সমস্ত লেখক, পাঠককে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

নারগিস পারভীন

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় আমাদের স্বপ্ন

মহঃ কুদ্দুস আলি (কোষাধ্যক্ষ)

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় ভাঙ্গড়বাসীর স্বপ্ন। সাধারণ মানুষের বহুদিনের স্বপ্ন একদিন সার্থক হলো। আমাদের পথচলা শুরু হলো। বহু ছাত্র-ছাত্রী দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে এখানে আসে উচ্চ শিক্ষার জন্য, আগে যা সম্ভব ছিল না। ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে মেয়েরা ও এখানে লেখা পড়ার জন্য আসছে-এর মতে আনন্দের বিষয় আর কি থাকতে পারে।

প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ভেবেই ২০০৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী যোগ দেওয়া নতুন অধ্যক্ষ মহাশয় বিল্ডিং বাড়ানোর কাজে হাত দেন। তিনতলা প্রায় সম্পূর্ণ। হাতে নাতে প্রচুর পরিশ্রম করে দিবা রাত্র কাজ করতে গিয়ে কষ্ট কম হচ্ছে না। কিন্তু সমস্ত কষ্টের শেষে যখন স্বপ্ন পূরণের কথা ভাবি তখন আনন্দে দু-চোখ জলে ভরে ওঠে।

আগামী দিনে এই কলেজ আরো বড়ো হবে, বিভিন্ন কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। ছেলে-মেয়েরা কাজ পাবে। অর্থনৈতিক সমস্যা দূর হবে, সমাজ এগিয়ে যাবে। এই আশা আমরা রাখি। কলেজের বার্ষিক পত্রিকা 'সৃষ্টি' প্রকাশের পথে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিয়মিত পঠন-পাঠনের বাইরে গিয়ে নতুন সৃষ্টির আনন্দে মেতেছে। এই সময় আমার ও আনন্দ কম হচ্ছেনা। সেই আনন্দ সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে।

"আহা! আজ কি আনন্দ আকাশে বাতাসে"।

প্রবন্ধ

"অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।"

নারী মুক্তির ভাবনা : গল্পগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ॥

– **নিরুপম আচার্য** (অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ)

এক

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে সমাজের উপেক্ষিত নারীদের কিছুটা সম্মান দেখানো গেছে, তাদের শিক্ষার আলোয় আনা গেছে, তাদের প্রতি যে অন্যায়, অত্যাচার, অবহেলা করা হতো তার কিছুটা প্রতিবিধান করা গেছে এর থেকে বড়ো প্রাপ্তি আর কী হতে পারে ? 'কিছুটা' বলছি এই কারনে, আমাদের দেশে এখনো নারীরা ধর্ষিতা হন, তাঁরা লজ্জা ঢাকতে গলায় ফাঁস লাগান, এখনো কালো বলে নারীদের বেশী পণ দিতে হয়। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা দাস-দাসী সুলভ আচরণ করেণ। কোথাও খুন হতে হয়, কোথাও পাচার করা হয়, মোটা অঙ্কে, কোথাও নিষিদ্ধ পল্লীতে ব্যবসায় লাগানো হয়–সর্বত্রই 'বিচারের বানী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'।

একটা সময় ছিল যখন নারীদের স্থান অন্ত:পুরে সীমাবদ্ধ ছিল, সন্তান উৎপাদন ও হেঁসেল সামলানো ছাড়া সংসার বা সংসারের বাইরের কোনো কাজে তাঁদের অধিকার ছিল না। অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের সূচনা লগ্ন থেকে চিত্রটা একটু একটু করে বদলাতে থাকে। ব্রিটিশদের সাহচার্যে এসে তৎকালীন উদারপন্থী সমাজ সংস্কারকদের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, বাল্যবিবাহ রদ, বহুবিবাহ রদ, বিধবা বিবাহ প্রচলনের মাধ্যমে নারীদের গলার ফাঁস কিছুটা আলগা হতে শুরু করেছিল। এই কাজে যে দুটি নাম সর্বাগ্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে আসে তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

উনবিংশ শতাব্দী ও তার পূর্ববর্তী সময়ের ছবি ধরা আছে বিভিন্ন গ্রন্থে। একটা অবক্ষয় তো শুরু হয়েছিল ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য যুবক-যুবতীদের দ্বারা। প্রাসঙ্গিক তথ্য ধরা আছে ভবানীচরণের 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাসে' বা মধুসূদনের দুটি প্রহসনে। বঙ্কিম পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও তার পরবর্তী সময়ে সবুজপত্রের যুগেও বিভিন্ন রচনায় বিচিত্রভাবে তা বর্ণিত হয়েছে।

দুই

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হন তখন ছবিটা দ্রুত না হলেও বদলাতে শুরু করেছে। নারীদের নানা সমস্যা বলিষ্ঠ ভাবে সাহিত্যে উঠে আসছে। এই কাজটা যেভাবে রবীন্দ্রনাথ করতে শুরু করেণ তা আমাদের বিস্মিত করে। কেবল নারীদের সমস্যা নয়। যেখানে যেখানে বিচ্যুতি ছিল, অসংগতি ছিল, অমঙ্গল ছিল সেখানেই তাঁর কলম গর্জে উঠেছে। কবিতা, গানে, প্রবন্ধে, উপাখ্যানে, গল্পে তিনি অসাধারণ সমাজ সচেতনতার পরিচয় রেখেছেন। আমাদের উদ্দিষ্ট তাঁর ছোটোগল্পে বর্নিত নারী মুক্তির ভাবনা প্রসঙ্গটি। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ছে 'সবলা' কবিতার চরণ কয়েকটি–

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
নত করি মাথা

পথ প্রান্তে। কেন রব জাগি
ক্লান্ত ধৈর্য, প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।

এর পরই কবি প্রশ্ন করেছেন–

'শুধু শূন্যে চেয়ে রব ?'

এই হতাশা এবং হতাশা উত্তরনের ছবিকেই তিনি বিভিন্ন গল্পে লিপিবদ্ধ করেছেন।

তিন

প্রথমে 'দেনা পাওনা' গল্পের কথা ধরা যাক। এটি একটি হৃদয়স্পর্শী গল্প। সেই সময় মেয়েদের শ্বশুর বাড়িতে কতটা অত্যাচার সহ্য করতে হতো, কিভাবে মেয়েদের পন্য হিসেবে দেখা হতো তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এটি। বিশিষ্ট রায়বাহাদুর পরিবারে ঘটা করে গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র নিরুপমার বিবাহ হয়। কন্যাদায় গ্রস্ত বাবা বিয়ের সময় যে পরিমান পণ দেওয়ার কথা ঘোষনা করেন তা এখনো দিতে না পারার জন্য নিরুপমাকে সহ্য করতে হয় অবর্ণনীয় অত্যাচার। অসুস্থ হয়ে খাওয়ায় অরুচি এলে শাশুড়ি বলেন–"নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা গরীবের ঘরের অন্ন ওঁর মুখে রোচেনা।" এভাবেই উঠতে বসতে তাকে নানা ভাবে খোঁটা দেওয়া হয়। চরম লাঞ্ছনা সহ্য করতে করতে সে যখন ভীষন অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং বাবাকে দেখার জন্য বাপের বাড়ি যেতে চায়, তখন তাকে 'ছল' বলে ব্যাখ্যা করা হয়। অবশেষে নিরুপমার মৃত্যু হয় এবং খুব ঘটা করে চন্দন কাঠের চিতায় সাজিয়ে সৎকার করা হয়। তাতে রায় বাহাদুরের মুখ রক্ষা হয়। আর এরপরই দেখা যায় কাল বিলম্ব না করে পুনরায় তাঁদের ছেলের বিবাহের তোড়জোড় করা হয়। এমন কি নিরুপমার মৃত্যু সংবাদ ও পুত্রকে জানানো হয়নি। পুত্র যখন লেখেন–"আমি এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি। অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবে।" তার উত্তরে রায় বাহাদুরের মহিষী লেখেন–"বাবা তোমার জন্য আর একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে। এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।"

পুত্র বধূর মৃত্যুর পর নিজের সন্তানকে যে শাশুড়ি এরকম চিঠি লেখেন তাঁর সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল।

এরপর আমরা 'সমাপ্তি' গল্পের কথা বলতে পারি যেখানে বধূ নির্বাচন থেকে শুরু করে বিবাহ পরবর্তী জীবনেও নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। অপূর্ব কৃষ্ণ যখন মৃন্ময়ীকে বিবাহ করার কথা ঘোষনা করল তখন তার মা বিস্মিত ও হতবাক হয়েছিলেন কারণ মৃন্ময়ীর যা রূপ ও স্বভাব তাতে তাকে বৌমা হিসেবে মেনে নেওয়া যায়না। গল্পকার লিখছেন–

'মৃন্ময়ী শ্যামবর্ণ। বালকের মতো তার মুখের ভাব। মস্তমস্ত কালোচক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাব ভাব লীলার লেশ মাত্র।'

এ হেন মেয়েকে অপূর্ব যখন পছন্দ করে বিয়ে করলো তখন আর উপায় না দেখে শাশুড়ি সংশোধন কার্যে প্রবৃত্ত হলেন। মৃন্ময়ীর সরলতা, উদ্দামতাকে শাসন করে শাশুড়ি বলেছেন–" দেখো বাছা তুমি কিন্তু আর কচি খুকি নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।" মেয়েদের বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে কেমন

ব্যবহার করা হতো তা পূর্ববর্তী গল্পে পেয়েছি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। নিরুপমার মতো মৃন্ময়ী ও বাপের বাড়ি যেতে চাইলে একই সুরে শাশুড়ি বলেন–"কোথায় ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই, বলে বাপের কাছে যাবো। অনাসৃষ্টি আবদার।" এই গল্পে মৃন্ময়ী কিন্তু শাশুড়ির নিষেধ শোনেনি। গভীর রাত্রে সে ঘরের বাইরে বেরিয়েছে। এটা দু:সাহস হলেও, বেড়া ভাঙার সাহস সে দেখিয়েছে। উনবিংশ শতকের মেয়েরা যে শুধু পড়ে পড়ে মার খাবে না তারই আভাস এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

'ত্যাগ' গল্পে জাত-পাতের সমস্যাকে দেখানো হয়েছে। হেমন্ত বিয়ে করেছিল কুসুমকে। যদিও বিয়ের পূর্বে সে জানতো না কুসুম নীচু-জাতের তা কিন্তু কুসুমকে সে মনে প্রানে ভালো বেসেছিল। তাই পিতা হরিহরের নির্দেশ–বউকে এখন বাড়ি হইতে দূর করিয়া দাও"–মানতে পারেনি। উত্তরে সে বলেছে–'আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিবনা'। হরিহর গর্জিয়া কহিল–জাত খোয়াইবি ? হেমন্ত উনবিংশ শতকের নবজাগরণে দীক্ষিত মানবাত্মার পূজারীর মতো বলেছে–'আমি জাত মানি না'। এর দ্বারাই প্রমানিত হয় সমাজে নারীরা ধীরে ধীরে তাদের স্বামীদের সহায়তা লাভ করছে। এতো উত্তরনেরই লক্ষণ।

তখনকার দিনে মেয়েদের কে পণ্য সামগ্রীর সঙ্গে ও শ্বশুর বাড়িতে দাস-দাসীর সঙ্গে তুলনা করা হতো তা পূর্বে বলেছি। কিন্তু বিয়ের সময় নির্লজ্জভাবে যৌতুক দ্রব্য যাচাই করা যে পাত্রীকে চূড়ান্ত অপমানিত করা সে কথাই ১৩৯৯ এ লেখা 'অপরিচিতা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। ছেলেদের কোনো বিয়ের বয়স নেই এবং তারা যতখুশি বিয়ে করতে পারে তাতে কোনো বিধি নিষেধ নেই ; কিন্তু মেয়েদের পনের ষোলো বছর বয়সটাই তখন অনেক ছিল তাও এ গল্পে দেখানো হয়েছে।

'কিন্তু মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই ? না, দোষ নাই বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না।" এবং শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি সমাজের আচারকে মেনে নিয়ে চিরকারের মতো ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।"

'জীবিত ও মৃত' গল্পে শারদাসঙ্কর বাবুর বাড়ির বিধবা বধূটিকে মরে প্রমান করতে হয়েছিল সে মরেনি। তার পিতৃকুলে, পতিকুলে কেউ ছিল না। সংসারে তার প্রচুর অবদান ছিল কিন্তু একদিন সবাই যখন মনে করলো সে মারা গেছে ও শ্মশানে নিয়ে গেল পোড়ানোর জন্য তখনই হঠাৎ প্রাণ ফিরে পায় গল্পের নায়িকা কাদম্বিনী। পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তনেই গল্পের ক্লাইমেক্স জমে ওঠে। কেউ বিশ্বাস করতে চাইলো না যে সে জীবিত আছে। তখন সে নিজেই বলেছে– "ওগো আমি মরি নাই গো, মরি নাই আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব আমি মরি নাই। এই দেখো আমি বাঁচিয়া আছি।"

অবশেষে কাদম্বিনীকে পুস্করিনীতে ঝাঁপ দিতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ গল্পের শেষ চরণে সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছেন–

"কাদম্বিনী মরিয়া প্রমান করিল সে মরে নাই ॥

সেই সময় বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা ভালো ছিল না। সমাজের প্রচলিত কু–সংস্কার-গোঁড়ামীর শিকার হয়েছে মেয়েরাই বেশী। কখনো কখনো স্বামীর দোষ নিজের কাধেঁ তুলে নিয়ে আত্মবলিদান দিয়েছে। কখনো স্বামী জোর করে দোষ চাপিয়ে দিয়ে বাঁচতে চেয়েছে বা বাঁচাতে চেয়েছে পরিবারকে। সেখানেও সে মুখ বুজে নীরবে সব সহ্য করেছে। 'শাস্তি' আমাদের খুব পরিচিত গল্প। যেখানে নিত্য অভাবের সংসারে একদিন দুখিরাম তার স্ত্রী রাধাকে দা দিয়ে মেরে ফেললো তখন তার ভাই ছিদাম নিজের স্ত্রী চন্দরার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে

দাদাকে বাঁচাতে চেয়েছিল। প্রথমে স্ত্রী স্বামীর এ হেন আচারণে তার হতবাক হলেও পরে অভিমানে চুপ করে সব সহ্য করেছে। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে এ-ও আমরা দেখেছি।

গল্পগুচ্ছের বিভিন্ন গল্পে এরকম উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যাবে যেখানে নারীদের অসহনীয় ভাবে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তেমন ভাবে প্রতিবাদী হতে আমরা দেখিনি। ১৩২১এর শ্রাবনে পত্রকারে যে গল্পটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন তার নাম 'স্ত্রীর পত্র'। এই দীর্ঘ গল্পে এক রমণী চিঠি লিখেছেন তার স্বামীকে। যার প্রতিটি চরণে সমাজ বচিঞতা নারীর ক্ষোভ, না পাওয়ার বেদনা, তীব্র শ্লেষে ঝরে ঝরে পড়েছে। যেখানে ঘোমটা টানা পল্লীর নারীরা যেন আধুনিক। প্রতিবাদী সম্পূর্না নারী হয়ে উঠেছে-যারা বলবে-"যাব না বাসর কক্ষে বধূ বেসে বাজায়ে কিঙ্কিনী

"আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীর হস্তে বরমাল্য লব একদিন
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে।
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,-
ফেলে দেবো, আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।"

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি শুরু হয়েছে পতির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও বিনয় জানিয়ে-'শ্রীচরণ কমলেষু'। শেষ হয়েছে-'চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন-মৃণাল'-বলে।

মৃণাল এই গল্পে বিনীত ভাবে পত্রাকারে তার স্বামীকে বোঝাতে চেয়েছে যে নারীরা আর পুরুষ সমাজে পায়ের নীচে থাকবে না, যে ধীরে ধীরে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠবে সে দিন আর বেশী দূরে নেই। বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের রূপটা যে একটা বড় Factor তা মৃণাল চিঠিতে লিখেছে। বিবাহের পর কন্যার বিভিন্ন খুঁত গুলিকে যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আবিষ্কার করা হয় এবং তার পর শুরু হয় নানা রকমের অত্যাচার সে কথা ও মৃণাল লিখেছে। সেই লিখবার ধরণটা লক্ষ্য করবার মতো।

"সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল-তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুম। আমার খুঁতগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপর আমি সুন্দরী বটে। কিন্তু আমার রূপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রূপ জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পন্ডিত গঙ্গা মৃত্তিকা দিয়ে গড়বেন, তা হলে ওর আদর থাকত; কিন্তু ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।"

নিরুপমা যা পারেনি। মৃণাল তা করে দেখিয়েছে। নারীদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার এ এক দৃপ্ত পদক্ষেপ। প্রবন্ধের সূচনায় বলেছিলাম এক সময় নারীরা ছিল শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র-তাদের সঙ্গে অবহেলিত ছিল সন্তান উৎপাদনের কারখানাটি ও। 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণাল লিখেছেন-"মনে আছে, ইরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং আঁতুড় ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জার আসবাবের অভাব নেই। আর অন্দরটা যেন পশমের কাজের উলটো পিঠ

সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেদিকে আলো মিটমিট করে জ্বলে, হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে। উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেঝের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে।"

এই গল্পের মূল কাহিনী পরিবর্তিত হয়েছে বিন্দুকে কেন্দ্র করে। মৃণালের একঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটুকরা ঠান্ডা বাতাস নিয়ে তার প্রবেশ মৃণালদের পরিবারে। সেই সময় মেয়েরা কত অসহায় ছিল তার নিপুন বর্ণনা আছে এই গল্পে। বিন্দুর কথা বলতে বলতেই মৃণাল নানাভাবেভঙ্গীতে তার বঞ্চনার কথা বলেছে। গল্পে জানা যায় বিন্দুর বিয়ে হয়েছিল এক পাগলের সঙ্গে। বিয়ের পরে পরেই সে পালিয়ে এসে কয়লা রাখার ঘরের এক কোনে লুকিয়ে রইল। তার পর নানা ঘটনা অবশেষে গায়ে আগুন দিয়ে সে মরেছিল। এই প্রসঙ্গে বাড়ির অন্যেরা বলল-"এ সমস্ত নাটক করা।" একথা শুনে মৃণাল বলেছিল-"কিন্তু নাটকের তামাসাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীর পুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটা ও তো ভেবে দেখা উচিত।"

এই প্রতিবাদের দৃপ্ত ভাষা নারী জাগরণের পথ দেখিয়েছিল নি:সন্দেহে। কিন্তু নিজের প্রসঙ্গে মৃণাল যখন বলে-"দু:খ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিলনা। তোমাদের ঘরে খাওয়া পরা অসচ্ছল নয়, তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হত তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো পতি দেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্ব দেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাইনে-আমার এ চিঠি সে জন্যে নয়"।

এই উক্তির মধ্য দিয়ে মৃণালের মধ্যে যে সাহস ও নির্ভিকতা আমরা দেখতে পাই তা পরবর্তী কালে বাঙালী তথা ভারতীয় নারী সমাজে প্রতিবাদের সাহস যুগিয়েছে। সে তাই বলে-'আমি ও বাঁচব আমি বাঁচলুম।' এই বাঁচার মধ্যেই উনিশ শতকের নারী সমাজ তাদের বাঁচার জন্য দম ভরা শ্বাস নিল॥

পরিবেশ ও পুরস্কার

ইদ্রিস আলি মোল্যা [প্রথম বর্ষ –অনার্স(ভূগোল)]

শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার নিয়ে এ পর্যন্ত যত অশান্তি হয়েছে আর কোন পুরস্কার নিয়ে তা হয়নি। অহিংসার আদর্শের সঙ্গে যার নাম অক্ষয় বন্ধনে আবদ্ধ। সেই মহাত্মা গান্ধীকে কেন নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়নি, এই বিতর্ক আজ ও চলছে। নোবেল কমিটিকে স্বীকার ও করতে হয়েছে এটা তাদের একটা বড় ভ্রান্তি। দারিদ্র মোচনের অভিনব প্রয়াসের জন্য যখন বাংলাদেশের মহম্মদ ইউনুস এই সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠেছিল, এই উদ্যোগের জন্য শান্তির পুরস্কার কেন ? তাই এবার তর্ক উঠেছে, পরিবেশ রক্ষার চেতনার প্রয়াসের জন্য কি এই পুরস্কার দেওয়া উচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্টের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরের সঙ্গে এই সম্মান যুক্তভাবে দেওয়া হয়েছে "***" বা আইপিসিসি থেকে। রাষ্ট্র সংঘের উদ্যোগে গঠিত এই সংস্থার শীর্ষে রয়েছেন ভারতীয় পরিবেশবিদ রাজেন্দ্র কুমার পচৌরি। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হলেও দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রয়েছেন পরিবেশ প্রয়াসের সঙ্গে। *** দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি দিল্লীতে একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নেতৃত্ব দিয়েছেন পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণায়। তাই আর এক ভারতীয় নাম দুনিয়ার সেরা পুরস্কারের সঙ্গে যুক্ত হলে এদেশের মানুষ অবশ্যই গর্ববোধ করবেন। তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা উষ্ণায়নের জন্য পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের আশঙ্কা নিয়ে প্রচারে নিয়েছেন অগ্রনী ভূমিকা। দেশে-বিদেশে ছুটে বেড়িয়ে তিনি সকলকে সজাগ করতে চাইছেন এই বিপদ সম্পর্কে। তার এই প্রয়াসকে কেন্দ্র করে রচিত তথ্যচিত্র **** (অ্যান ইকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ) গত বছর অস্কার পেয়েছিল। এবার তিনি পেলেন নোবেল পুরস্কার।

মানুষের হঠকারিতার ফলে এবং নির্বিচার শিল্পোন্নয়ন এর পরিনামে এমন এক ভবিষ্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারে যেখানে মাণুষের অস্তিত্ব হয়তো বিপন্ন হয়ে পড়বে। কার্বন-ডাই অক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত নিগমনই যে আমাদের এই পরিনামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এই বিষয়ে ক্রমশই অধিকাংশ বিজ্ঞানী একমত হচ্ছেন।

মাত্র কয়েদিন আগে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকেও বলতে শুনেছি যে, উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের আশঙ্কা মোটেই অমূলক নয়। এমন কথা অনেকে তো বলছে সত্তাসবাদের পর এই উষ্ণায়ন জনিত সমস্যাই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা। কেউ কেউ একে "পরিবেশ সন্ত্রাস" বলেছেন এটা মোটেই উপেক্ষনীয় বিষয় নয়।

আমি একজন বিশ্ববাসী হয়ে বলতে চাইছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের কি ঘুম ভাঙ্গবে। কারণ এই উষ্ণায়ন এর জন্য তারাই বেশি দায়ী। এক গননায় জানা গেছে মাত্র ৫% মানুষ চাষবাস করেন, বাকি সব শিল্পী এবং চাকুরিজীবী।

তাই শান্তির পুরস্কার যদি তাদের কিছুটা উদ্বুদ্ধ করতে পারে তবে নোবেল কমিটির সিদ্ধান্ত সার্থক হবে।

স্ত্রী শিক্ষার ইতিহাস

ওসমান সাঁপুই (বি.এ- দ্বিতীয় বর্ষ)

এ কথা কারো অজানা নয়। একশো বছর আগে বাংলা দেশে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কথা খুব একটা একটা ভাবা হতো না। দু-একটা সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে কেবলমাত্র মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হত। তাও ঘরের মধ্যে।

সেকালে মেয়েরা শিক্ষা লাভের সুজোগ থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে তারা সমাজের বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো।

এখন দেখা যাক একশো বছর আগে কেমন ছিল দেশের শিক্ষা ব্যাবস্থা ? খ্রীস্টান মিশনারীদের চেষ্টায় কোথাও- কোথাও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু সমাজে তার কোন প্রয়োজন মানতে চাই নি। বরং সেই সময় একথা প্রচলিত ছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে সে নাকি বিধবা হবে, কিন্তু সেই সমাজে নিরক্ষর মেয়েরাও বিধবার হতো।

সে কালে মানুষেনর এই ধারণা ছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখনে তাদের আর ঘরসংসারে মন থাকবে না। এক কথায় সে সময় মেয়েরা ছিল একটা গণ্ডির মধ্য আবদ্ধ। তাদের এই গণ্ডির বাইরে আনতে কয়েকজন সমাজকল্যানকারী ব্যক্তি উদ্যেগ গ্রগণ করেছিলেন–বিদ্যাসাগর, ডেভিড হেয়ার, কেশব চন্র সেন আরও অনেক।

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি তখনও স্ত্রীলোকের শিক্ষা খুব প্রচলিত ছিল না। এই কথার পরিপেক্ষিতে একথা জানা দরকার যে আমাদের দেশে প্রাচীন যুগেকে আমরা বৈদিক যুগে জন্ম গ্রহন করেছিল গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি। গার্গী রাজসভায় দার্শনিক তত্বের বিচার করতেন।

মোট কথা প্রাচীন সমাজে স্ত্রী জাতির একটা সন্মান ছিল।পরবর্তী যুগে ঠিকতার এর বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দির আগে ক্রমে স্ত্রী শিক্ষা লুপ্ত হয় ।

উনিশ শতকের শুরেতে আমাদের দেশে নারী শিক্ষার বিশেষ কোন অগ্রগতি হয়নি। এদেশে নারী শিক্ষার প্রসারে খ্রীষ্টান মিশনরীরাই সর্বপ্রথম উদ্যেগ গ্রহন করেন। ভারতে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে শ্রীমতী কুক এবং লণ্ডনের চার্চ মিশনারী সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। এছাড়া নারী শিক্ষার প্রসারে"কলকাতা স্কুল সোসাইটি", "ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি" ও "লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন"–প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১৮২১–২২খ্রীষ্টাব্দে একজন ব্রাক্ষন পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকার স্ত্রী শিক্ষা সমন্ধে একটি বই লিখেছিলেন। সেই 'স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক' বইটিতে গ্রামের ও শহরের মেয়েদের কথোপকথোন বার্তা লেখা হয়েছিল। বইটাতে এক মহিলার উক্তি উল্লেখ আছে। তিনি বলেছিলেন মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিবধা হবেই। ১৮৪৯ সালে ড্রিক ওয়াটার বেথুন–এর উদ্যোগে ও বিদ্যাসাগরের চেষ্টায়'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। পরে এখানে একটি মহিলা কলেজ স্থাপিত হয়। বর্তমান যার নাম বেথুন স্কুল ও কলেজ। প্রথমে এই কলেজে পড়ার জন্য কোন ছাত্রী পাওয়া যায় নি। কলেজের নিয়ম ছিল যে বাড়ী থেকে ছাত্রীদের আনা হবে ঘোড়ার গাড়ী করে। যতক্ষণ ছাত্রীরা কলেজে থাকবে

ততক্ষন কোন পুরুষ কলেজের চারপাশে যেতে পারবে না।

১৮৪৯ সালে যখন কলেজ শুরু হয় তখন কলেজের ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬ । ১৮৬৮ সালে ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৩০ জন। আবার তাও ঐ ৩০ জন ছাত্রীর বয়স ছিল ৮ কিংবা ১০ বছর। প্রশ্ন হল কি কারণে কলেজের ছাত্রী সংখ্যা কম? তখন মিস কার্পেন্টার বলে একজন ইংরেজ মহিলা, তিনি বলেন যে, এখানে ভালো মাষ্টার নেই। তাই শিক্ষকদের শেখাবার জন্য একটি কলেজ খোলা হোক। মেরী কার্পেন্টার তার দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু এতেও দেখা গেল কোন ভদ্রঘরের মেয়ে স্কুলে আসছে না। শেষ পর্যন্ত গর্ভ মেন্ট স্কুল বন্ধ করে দিল। এই সময় কেশব চন্দ্র সেন বলেন যে মেয়েরা স্কুলে আসায় যদি অভিভাবকদের আপত্তি থাকে তাহলে শিক্ষিত মেম সাহেব গন বাড়ীতে দিয়ে পড়াবে। কিন্তু তাতেও বিরোধ দেখা যায়। মেম সাহেবদের হিন্দু বাড়িতে ঢুকতে দিতেও নারাজ ছিল অভিভাবকরা শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে হিন্দু শিক্ষক বাড়ী বাড়ী গিয়ে শিক্ষা দবেনে এবং পরীক্ষা নেবার জন্য বাড়াতে বাড়ীতে প্রশ্ন পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পরীক্ষায় পাশ করলে পুরস্কার দেওয়া হত। এইভাবে বিভিন্ন বাধা পেরিয়ে শুরু হল মেয়েদের শিক্ষা ব্যাবস্থা।

ধীরে ধীরে আমাদের দেশের স্ত্রী শিক্ষার অগ্রগতি দেখা গেছে। পূর্বে আমরা দেখেছি যে, বেথুন কলেজের জন্য ছাত্রী পাওয়া যেতনা। অথচ বর্তমানে বেথুন কলেজের ভর্ত্তির জন্য মেয়েরা মাথা ঢুকছে এবং কালের গতিতে মেয়েদের স্কুল কলেজে না পাঠিয়ে ঘরে রাখাটা লজ্জার বলে গণ্য হওয়ায় মেয়েরা সব দিক থেকে সুজোগ পাচ্ছে সময়ের স্রোতে কোন গোঁড়ামীই ঠেকাতে পারেনি।

আজকের বর্তমান সমাজে পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীরাই যেন বেশি এগিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে এসেছে প্রবল আবেগ আর তার জন্য তারা সাগর পার হয়ে, আকাশ পাতাল চষতে পিছপা হয় না।

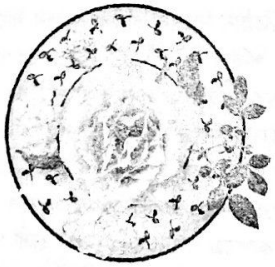

আর্তের সেবা

উম্মে রাইহানা পারভীন(বি. এ.-প্রথম বর্ষ,রোল-৪৭৮)

সেবা একটি মহৎ কাজ। আর্তের সেবায়, দীন দুঃখীর দুঃখ দুর করার চেষ্টায়, পীড়িত আহতদের সেবায়, অক্ষম ও অসমর্থের সাহায্যে এগিয়ে আসা, এক কথায় নির্যাতিত মানবের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা সকল মানুষের কর্তব্য। পৃথিবীর সব সময়ে মানুষে সেবাকে অত্যান্ত উচ্চ স্থান দিয়েছেন।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ইহমান বা পারোপকার পরমপূণ্য কাজ বলে গৃহীত হয়। ইসলাম মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যদা দিয়ে সৃষ্টির উপর সন্মান করে দিয়েছে। এ বিশ্ব সৃষ্টির মহিমা অক্ষুন্ন রেখে প্রতিটি প্রক্রিয়া যথাযত রুপে প্রতিপালন করে মানুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের সহায়ক হবে এবং মানব কল্যানে মতে নিজেকে বিলিয়ে দেবে। এই তো মানব সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষ নিজের বুদ্ধি ও জ্ঞনের বলে নিজের স্বার্থ পরের তথা বিশ্বের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হবে ততই কল্যান, বিশ্ব প্রসারী ও বাস্তবানুগ হবে। তাই ব্যাক্তিই সমাজের আদর্শ বিকাশ স্থল।

সুসংহত সুষ্ঠু সমাজ জীবন যাপনের জন্য, মানবের জন্য যতগুলো অভিব্যক্তির বিকাশ সম্ভব ও প্রয়োজন। ইহসান বা দয়া তার মধ্যে একটি। দয়া থেকেই উদ্ভূত হয় কল্যন কামনা। সেবা, সংহতি আর শৃঙ্খলা বিধানের সুষ্ঠু ধারণা থেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে ইহসান বা দয়া সম্ভব। আপনি যদি নিজের ব্যাথা বলে গ্রহন না করতে পারেন অপরের ক্ষুধা, অপরের দীনকে যদি আপনার ক্ষুধা বা দীন বলে স্বীকার করে না নিতে পারেন, তবে কোন মুখে মানবতার বুলি আওড়াবেন।

আপনি পরম শান্তিতে আপনার প্রাসাদে শুয়ে আছেন, আপনার পাশেই বন্যা পীড়িত আর্ত বাস্তুত্যাগী কপর্দক হীন সামান্য একটুখানি মাথা গোজবার জন্য হা করে করুন নয়নে তাকিয়ে আছে। তাদের কাতর কান্না আপনার সুখ নিদ্রার এতটুকু ব্যাঘাত করলনা। মানবতা যেখানে বিপন্ন, মানুষ যেখানে সামান্যতম প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়, ব্যাথাতে আর্তনাদে যেখানে আকাশ বাতাস বিষিয়ে উঠছে সেখানে আপনি নির্বাক দর্শক মাত্র। তা সত্বেও কি আপনি মানবতাবাদী? মানবতা এত সহজ নয়। ইসলামের দূত বলেন, মানব পরস্পরের প্রতি প্রেম, প্রীতি ও দয়ার একটি দেহতুল্য। দেহের বিশেষ অঙ্গে ব্যাথা পেলে সমস্ত দেহটাই ব্যাথিত হয়ে। সমাজের একজনের দুঃখ তা গোটা সমাজটারই ব্যাথার কারন হয়ে ওঠে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন-

"জীবে প্রেম করে যেইজন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আজ কত শত নর নারী, ও অসহায় শিশু আপনার দিকে কাতর নয়নে তাকিয়ে আছে, আর আপনি কি চোখ বুজে থাকবেন? মানুষের পরীক্ষার জন্য নানা ভাবে দুঃস্থ ও নিপিড়িত মানুশের সানিধ্যে এনে প্রভু দেখতে চান মানুষ মানুষের জন্য কাঁদে কি না। বলা হয় বিচারের দিন প্রভু তার বান্দাকে বলবেন, আমি পীড়িত ছিলাম, আমাকে শুশ্রষা করোনি,আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আমাকে খেতে দাওনি।আম তৃষ্ণার্ত ছিলাম আমাকে পানি দাও নি। আমি নিরাশ্রয় ছিলাম, আমাকে আশ্রয় দাওনি।বান্দা বলবে, "হে প্রভু তুমি তো শ্রেষ্ঠ পালনকর্তা, তুমি কিভাবে পিড়ীত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত,ও নিরাশ্রয় ছিলে? তোমাকে কি ভাবে সাহায্য করব" ? প্রভু বলবেন

তোমার প্রতিবেশি যখন পিড়ীত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণাত ও নিরাশ্রয় ছিল তখন তুমি তা নিবারন করলে আমাকে সেবা করা হত।অতএব এটা স্পষ্ট যে, মানবতার সেবাই প্রকৃত সেবা। যে মানুষকে ভালোবাসেনা সে প্রভচকেও ভালোবাসে না।

পারস্যের বিখ্যাত কবি সেখ সাদী সত্যই বলেছেন

"কিদমতে খালক ছাড়া নেই কোন ধর্ম
তসবীহ মুসাল্ল ও জুম্মায় কিবা কর্ম",

মানব সেবা তথা আর্তের সেবা ছাড়া কোন ধর্ম পথ নেই। আর্তের সেবায় নিবেদিত জীবনকেই সত্যিকার মানব কল্যানমুখী মানুষের জীবন বলা হয়েছে। যে অশিক্ষিতকে শিক্ষার আলো দানের ও অসচ্ছলকে সচ্ছলতা দানের উৎসাহ দেয় সেই তো প্রকৃত মানুষ।

কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রামি ও মুক্তিদাতা ফিদেল কাস্ত্রের বর্তমান অবস্থা

বাবাই বাছার (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৫৮৪)

বর্তমান বিশ্বের প্রধান প্রভূত্ব কারী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জের মধ্যে সর্ববৃহৎ দ্বীপ কিউবা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্লাট চুক্তি থেকে ১৯৫২ খ্রী: পর্যন্ত তাদের প্রভূত্ব স্থাপন করেছিল। এই দীর্ঘ সময় কালে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শব্দ উচ্চারিত হয় নি।

কিন্তু ১৯৫৯সালে ফিদেল কাস্ত্রো কিউবার শাষন ভার হাতে নেওয়ার পর সমাজ তন্ত্রদুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতিবাদ যানালেন। এর ফল স্বরুপ ১৯৬২ সালে কিউবার মিশাইল সংকট পৃথিবীকে প্রমাণ পারমানবিক যুদ্ধের কিনারায় নিয়ে এসেছিল।

কিউবার ভৌগোলিক অবস্থান হল আমেরিকার ফ্লোরিডা উপকূল থেকে১৫০ মাইল দূরে ক্যারোবিয়ান দ্বীপ পুঞ্জে।

ফিদেল কাস্ত্রোর বর্তমান অবস্তা সর্ম্পকে আমেরিকার বহু সংবাদ পত্র প্রকাশ করেছে যে তিনি মারা গেছেন। হাভানায় ২২শে ডিসেম্বর প্রায় সাড়ে তিন মাস পর তিনি এই সন্দেহের অবসান ঘটালেন। তিনি মন্তব্য করেছেন -এই তো আমি এখানে। কেউ বলতে পারে না কবে কার মৃত্যু হবে। আমি বেঁচেই আছি।

যারা তাঁর মৃত্যুর প্রত্যাশিত দিন গুনছে সেই আমেরিকা ও বিশেষ করে মায়ামির কাস্ত্রো বিরোধী কিউবাণরা সন্দেহ করতে পারে, সেই জল্পনার জল ঢালতে কাস্ত্রো হাত রেখেছিলেন সদ্য প্রকাশিত "দি এজ অফ টাবুলেট" বই টিতে।

কিউবার পাঁচ দশকের অবিসংবাদী নেতা সে দিণও। যাবতীয় জল্পনায় ইতি টেনে ঘন্টা খানেকের সাক্ষাতকারে তিনি জানিয়ে দিলেন, তিনি আছেন এবং সজাগ মস্তিকেই।

অরন্যের আত্মকথা

বাপি সিং (বি.এ-প্রথম বর্ষ)

প্রকৃত পক্ষে অরন্য কথাটি চলতি রুপ বন, আর এই বনকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম জীবযন্তর দলগত ভাবে বাঁচতে ও বসবাস করতে শিখেছিল, তাই তার ছিল বন্য । এবং এই বন্য জীব জন্তুদের মধ্যে উন্নত মস্তিকের মানুষ্য জাতী নামে একরকম জাতীর উন্মেষ ঘটে। এই মনুষ্য জাতী বানিজ্যিকগত দিক থেকে তারা বনকে ত্যাগ করলেও অভ্যান্তর গত দিক থেকে তারা তাদের বন্য জন্তুদের সেই আচরন ত্যাগ করতে পারেনী, তবুও বন থেকে ছিন্ন হয়ে হয়েছি সু-সভ্য মানুষ্য জাতী। কিন্তু যারা অরণ্যকে ছিন্ন করতে পিছপা হয়না, কারন তারা আজ বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে শ্রেষ্টজাতী।

অপর দিকে এই অরন্য হতবুদ্ধি সু-সভ্য মানুস্য জাতী এই আচরন দেখে নির্বাক, নিশ্চুপ, তাই তারা তাদের অস্তিত্ব হারানোর কোন প্রতিবাদ এই বিংশ শতাব্দীর সুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মনুষ্য জাতীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনভাব লক্ষ্য করা যায়না।

সবথেকে দু:খের বিষয় এই যে তার প্রাকৃতি শক্তির বিরুদ্ধে আমরন সংগ্রাম করে কোন রকম নিজেরদের টিকিয়ে রাখলেও বিংশ শতাব্দীর সু-সভ্য মনুষ্য জাতী কাছে তারা হার মানে। অথচ প্রকৃত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে প্রকৃত এই অরন্যকে আলো, বাতাস, দান করে থাকে, তাই ভোর বেলা সূর্যিমামা পূর্ব গগনে উদয় হয়ে সর্ব প্রথম এই অরন্যকে সেলাম করে তখন অরন্যের গাছ গাছালি পাতাগুলো একে অপরকে ঠেলা ঠেলি করে সূর্যিমামা প্রতি উত্তরে সেলাম জানানোর আহব্বান জানায়। এর ফলে গাছ গাছালির পাতার মেসু মিট বনসুর বেজে ওঠে, এই সুরে অরন্যের জীবজন্তুর ঘুম ভেঙ্গে যায়, এবং অরন্য জাগার সঙ্গে সঙ্গে তারাও যেগে ওঠে, কারন তারা সু-সভ্য নয়। অথচ সু-সভ্য মানুষ তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। আবার অরন্য নৃত্য তালে নাচিয়ে যায় এই বাতাস, আবার এই বাতাসের প্রকপে পড়ে অরন্য প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে অরন্যের গাছ-গাছালির ডাল পালা। শষ্য ও পাতাগুলোকে আছড়াইয়ে, আছড়াইয়ে ডালপালা থেকে ছিন্ন করে দেয়।

আবার বৃষ্টি এই অরন্যের সতেজ করে। তাই এই অরন্য মাথা নত করে বৃষ্টিকে সেলাম দেয়। আবার এই প্রচন্ড বৃষ্টির যখন তাদেরকে ধ্বংশের পথে নিয়ে যায় তখন তারা শিকড় দিয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে।

আমরা দেখলাম, যে এই সকল প্রাকৃতিক শক্তি অরন্য বিনাশ করার চেষ্টা করলেও এই অরন্য প্রতি করুনাহিসবে কিছু প্রদান করে। অরণ্যকে ধ্বর্ংশ করে আজকের মানুষ।

অমূল্য জীবন

পূর্ণিমা মন্ডল (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৩৬৪)

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভূবনে"–কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনটা মোদের কতটুকু
এই ধরনীর পরে
তবুও মানুষ তাহারে লয়ে
কত অহঙ্কার করে।

জীবনের এক পরম সত্য মৃত্যু। জন্ম গ্রহন করলে মৃত্যু হবে এটাই স্বাভাবিক। তবু আমরা আমাদের জীবনটাকে নিয়ে কত অহঙ্কার করি। মৃত্যুকে ভয় না পেয়ে। মৃত্যু কথাটি শুনলে আমাদের মনে এক ভয়ের সৃষ্টি হয়। একটি শিশু যখন ভুমিষ্ট হয় তখন সে এই পৃথিবীর বুকে বড়ো হয়। পৃথিবীর আলো বাতাস পেয়ে এবং এক মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই পৃথিবী তাকে শেখায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালোবাসা। সকলকে আপন করতে শেখায় সেই জন্য তো অমূল্য এ জীবনটাকে ছাড়তে ভয় পাই সে। সে ভাবে এই মায়ার বন্ধন কেটে সবাইকে ভুলে কেমন করে প্রিয় দেহটাকে ছেড়ে দূরে চলে যাবে। সে ও তো চায় পৃথিবীর অপূর্ব রুপ অনুভব করতে। কিন্তু মৃত্যু তাকে কিছুতেই ছাড়ে না। সে আকুতি মিনতি করে, "হে প্রভু আমাকে বাঁচতে দাও। এই সুন্দর ভুবনে আমাকে থাকতে দাও"। ক্ষনস্থায়ী এ অমূল্য জীবন চিরস্থায়ী যে হয় না। তাই কবির কথায় বলা যায়–"চিরস্থায়ী নয়রে নীর হায়রে জীবনপদে, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে"।

আমরা সব কিছু আপন করে যখন সুখের স্বপ্ন দেখি ঠিক সেই সময় মৃত্যু নামক শব্দটি আমাদের মনে আসে আর এই অমূল্য জীবনটাকে ছাড়তে ভয় পায়। আত্মা অমর আত্মার কোনো মৃত্যু হয় না জেনেও আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই এই প্রিয় দেহকে ছাড়তে ভয় পাই। তাই আমরা সকলে মৃত্যুকে এড়িয়ে চলি। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মৃত্যুঞ্জয়' কবিতায় বাস্তব জীবনের এক চিত্র অঙ্কন করেছেন। এর থেকে এক করুন অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করি। এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে মৃত্যুকে চিনিয়েছে এবং তাঁকে মৃত্যুঞ্জয়ী কচ্ছে।

তাই সব শেষে বলা যায় জীবন নিয়ে অহঙ্কার ও মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কোন কারন নেই। পৃথিবীতে এসেছি যখন এমন কিছু কর্ম করে যাওয়া দরকার যার মধ্যে দিয়ে অমর হয়ে থাকা যায়।

"জগতে এসেছিস যখন রেখে যা"

স্বামী বিবেকানন্দ।

তাই মৃত্যুকে ভয় করার কোনো কারণ নেই, আমাদের কৃতিত্বের মধ্যে দিয়ে তাকে জয় করাই এক সাহসীকতার কাজ, সকলের করা উচিত। তবেই হবে মানব জীবন সার্থক।

মনুষ্য জাতির মানবিকতা

মোঃ হাফিজুল রহমান মোল্লা (বি.এ-প্রথম বর্ষ)

সে কবেকার কথা । আজও মনে পড়ে। স্তিব্ধ শিতুনী গ্রামের সন্ধ্যায় গরুর গাড়ীর শব্দে নির্জনপথ সচকিত হইয়া উঠিয়া ছিল। আবার তাহা নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গিয়াছে। পাশে বাঁশ বাগান পেরিয়ে গুটি কয়েক ঝাউগাছ। তাতে ফুল নাই, কুঁড়ি নাই, পাতার সম্পদে ভরা যেন কোনই দৈন্য নাই। ঘরে আলো নেই, বাহিরে ও অন্ধকার। পানা ঢাকা পুকুরের ধারে করমচার ঝোপে নি:শব্দে অন্ধকার জম,াট, বাধিয়া উঠিতেছে। এক ফালি চাঁদ সন্ধ্যার আড়ালে তাহা যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

ভাবতে ভাবতে বহুদুর চলে এলাম। আমি যাহা ভাবছি। অপরে তাহাই ভাবছে। তাই ভাবনার জন্যই ভাবনা। মাঝে একটু খানি দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছু নেই। ক্ষনিক কল্পনা আর তার রুপরেখা সুদুর প্রসারিত।

আজকে যখন মহাকাশ জয়ী সুনীতার মতো নারী আমাদের গর্ভ, অহঙ্কার, কেনই বা আমাদের ভাবনা। ভাবনা শুধু শ্রেষ্টত্বের শিরপায়। অর্থে, বৃত্তে অহমিকায় বলিযান। ধ্বংস করে অর্জন করতে হবে প্রসারিত জায়গা। তাইতো "ভালোবাসা" নামাক হৃদয়টার শিরচ্ছেদ! আমরা অনুভব করি, দুঃখ আছে তাই এত সুখ, হৃদয় আছে তাই এতো অনুভূতি, মন আছে তাই মতান্তর, জ্যোতি আছে তাই এতো জ্বালা, ভাঁটার টানেই আসে জোয়ার, এই ভাবে চূর্ণ বি-চূর্ণ হয় কত স্বপ্ন। মানুষ জাতি যে শ্রেষ্ট প্রানী এই শিরোপা কে দিয়ে ছিলেন ? বনের জন্তু না জানোয়ার। এই শিরোপা যদি আমরা নিজেরা অর্জন করে থাকি–তা হলে এতটুকু ভুল নেই কারো। শুধু রষ্ট্রিয় কাঠামোয় পড়ে মার খাচ্ছে কিছু অ-মূল্য প্রান। নিজেদের পরিভাষায় স্বচ্ছলতা রাখতে।

আর ধর্ম নামক যে পরিকাঠামো–সে খানে তো কোনো ভাবনা নেই। ভাবনা আছে কতটুকু–অপরকে দিলাম। না দিলাম কোনো ব্যাথা, বেদনা। অর্ধ-অনাহারে, অর্ধ পরিধানে থেকে প্রানজল ভাষায় অপরকে দিলাম তৃপ্তি, তবেই তো শ্রেষ্ঠাত্বের শিরোপা পাবে মানুষ্য জাতি।

বেশির ভাগ মানুষ জাতি পরকালে বিশ্বাসী। তবু ও তার একটা সত্ত্বা আছে। কৃষ্টিকালচার অনুযায়ী গ্রুপ–এ, বি, ও, এবং এ.বি যে কোনো একটি-ই হতে পারত। হোক না কেন বৃত্তবান বা হত-দরিদ্র সেতো মনুষ্য জাতি (নারী, পুরুষ)। আমরা মানি না ধর্মীয় সত্ত্বা। মানি–অর্থবিত্ত আর শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা। জীবন যৌবন আপন ধর্মীয় সত্ত্বাকে করি শিরোচ্ছেদ।

ছোট্ট এক ছবি, অবুঝ মনের এই অর্থহীন আলোড়ন ছাড়া আর কিছু নেই। তবুও স্মৃতির পাতা উল্টালেই কত ছবি প্রতনীয়ত দেখতে পাই।

ESSAYS

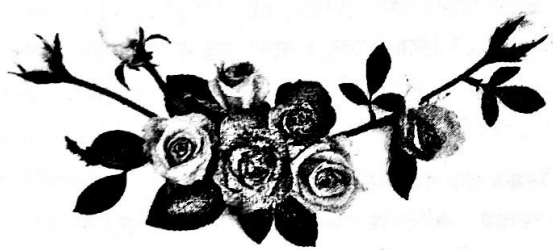

On ordinary differential operators associated with some special functions and their application to linear differential equations of higher order.

Dr. N.G Barik-Principal

1. ***Introduction*** :

In [1], we observe that some particular types of second order linear differential equations are solved by the Bessel's differential operators. The object of this paper is to consider the solutions of linear differential equations of second and higher orders by means of ordinary differential opprators associated with some special functions In [1,p151], I. I.H. Chen and T.W. Barrett first consider the following first order linear differential equation

(1.1) $\frac{dy}{dx} + \frac{n}{x} y = f(x)$,

where f(x) is a given function. When 'n' is a positive integer, the solution of(1.1)can be written as

(1.2) $y=\frac{1}{x^n}\int f(x)x^n dx+\frac{c}{x^n}$. If we put $\frac{d}{dx} + \frac{n}{x} = bn$, then we have

(1.3) $y = \frac{1}{bn} f(x) \approx \frac{1}{x^n}\int f(x)x^n dx + \frac{c}{x^n}$. When 'n' is a negative integer, we can write the fourmula analogous to(1.3)in the following form :

(1.4) $\frac{1}{b-n} f(x) = x^n \int f(x)\frac{1}{x^n} dx + cx^n$ Next Chen and Barrett consider the following second order differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{n}{x}\frac{dy}{dx} = f(x)$ only when n is any positive integer. We like to solve the equation when n is any positive or negative in a straight-forward way. When n is positive, the differential equation is expressed as $bn\frac{bn+b-n}{2} y = f(x)$.

In other words, $\frac{bn+b-n}{2} y = \frac{1}{bn} f(x)$.

Now by (1.3) we get $\frac{bn+b-n}{2} y = \frac{1}{x^n}\int f(x)x^n dx + \frac{c}{x^n}$.

Therefore,

$$y = \frac{2}{bn+b-n}\left[\frac{1}{x^n}\int f(x)x^n dx + \frac{c}{x^n}\right]$$

(1.5) $$= \int\left[\frac{1}{x^n}\int f(x)x^n dx + \frac{c}{x^n}\right]dx + c_1$$

Similarly utilizing (1.5) we get

$$y = \int\left[x^n \int f(x)\frac{1}{x^n} dx + cx^n\right]dx + c_2,$$

as a solution of the following second order linear differntial equation

$$\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{n}{x}\frac{dy}{dx} = f(x),$$

which is not consider by Chen & Barrett.

2. **Legendre, Hermite and Laguerre Type Differential Equations :**

Let us consider another type of first order linear differential equation $(1-x^2)\frac{dy}{dx}=f(x)$, which can be expressed as $\frac{bn+b-n}{2}y=\frac{f(x)}{1-x^2}$.

Thus $y=\frac{2}{b_n+b-n}G(x)$, where $G(x)=\frac{f(x)}{1-x^2}$. Now let $(1-x^2)\frac{d}{dx}=c_x$.

In other words,

(2.1) $\frac{1}{c_x}f(x)=\frac{2}{b_n+b-n}G(x)$.

We now consider the particular 'Lagendre type' linear differantial equation : $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2}-2x\frac{dy}{dx}=f(x)$.

Now the equation can be written in operator form $\frac{b_n+b-n}{2}c_x y=f(x)$, whence we have $c_x y=\frac{2}{b_n+b-n}f(x)=\int f(x)dx+c$. Consequently we have, $y=\frac{1}{c_x}[\int f(x)dx+c]$. Now applying(2.1) we immediately obtain $y=\frac{2}{b_n+b-n}[\frac{1}{1-x^2}(\int f(x)dx+c)]$. Hence we finally obtain $y=\int\frac{1}{1-x^2}(\int f(x)dx+c)dx+c_1$.

Next consider the first order linear differential equation $\frac{dy}{dx}-2xy=f(x)$. The solutoin of the equation is $y=e^{x^2}\int e^{-x^2}f(x)dx+ce^{x^2}$. Thus it can be easily written as

(2.2) $\frac{1}{bx}f(x)=e^{x^2}\int e^{-x^2}f(x)dx+ce^{x^2}$, where $b_x=\frac{d}{dx}-2x$.

We are now in a position to consider the particular 'Hermite type' equation $\frac{d^2y}{dx^2}-2x\frac{dy}{dx}=f(x)$, which can be expressed as $bx\frac{bn+b-n}{2}y=f(x)$. Now applying(2.2), we get $y=\int[e^{x^2}\int e^{-x^2}f(x)dx+ce^{x^2}]dx+c_1$. Again considering the following type of first order differantial equation $x\frac{dy}{dx}+(1-x)y=f(x)$, we obtain the solution of the equation in the form $y=\frac{e^x}{x}\int\frac{f(x)}{e^x}dx+c\frac{e^x}{x}$. The solution can be expressed in the operator form

(2.3) $\frac{1}{lx}f(x)=\frac{e^x}{x}\int\frac{f(x)}{e^x}dx+c\frac{e^x}{x}$, where $lx=\frac{d}{dx}+\frac{1-x}{x}$.

Now, we consider the particular 'Laguerre type' differantial equation: $x\frac{d^2y}{dx^2}+(1-x)\frac{dy}{dx}=f(x)$, which is expressed as $lx(\frac{bn+b-n}{2})y=G(x)$, where $G(x)=\frac{f(x)}{x}$.

Therefore applying(2.3), we obtain $\frac{bn+b-n}{2}y=\frac{1}{lx}G(x)=[\frac{e^x}{x}\int\frac{G(x)}{e^x}dx+c\frac{e^x}{x}]+C_1$. Finally we have $y=\int[\frac{e^x}{x}\int\frac{G(x)}{e^x}dx+c\frac{e^x}{x}]dx+C_1$.

3. A third order linear differantial equation : Consider the equation $\frac{d^3y}{dx^3}+\frac{n(1-x)}{x^2}\frac{dy}{dx}+2n\frac{(n-1)}{x^3}y=f(x)$,

which is equivalent to $\frac{bn+b-n}{2}b_n b_{-n}y=f(x)$. Thus $bn\,b-ny=\frac{2}{bn+b-n}f(x)=\int f(x)dx+c$. Again $b-ny=\frac{1}{bn}[\int f(x)dx+c]$. Now by (1.3), we have $b-ny=\frac{1}{x^n}[\int(\int f(x)dx+c)x^n dx]+\frac{c_1}{x^n}$, from which it follows that $y=\frac{1}{b-n}F(x)$, where $F(x)=\frac{1}{x^n}[\int(\int f(x)dx+c)x^n dx]+\frac{c_1}{x^n}$, lastly by (1.4), we immediately obtain $y=x^n\int F(x)\frac{1}{x^n}dx+c_2x^n$.

4. A fourth order differential equation : we consider the following fourth order linear differential equation $(1-x^2)\frac{d^4y}{dx^4}-6x\frac{d^3y}{dx^3}-\left[6+n(1-n)\frac{(x^2-1)}{x^2}\right]\frac{d^2y}{dx^2}-2n\frac{(1-n)dy}{x\,dx}=f(x)$, which can be expressed as $bnb-n(\frac{bn+b-n}{2})C_x y=f(x)$. Now appling (1.3) and (1.4), we obtain $\frac{bn+b-n}{2}C_x y=x^n\int F_1(x)\frac{1}{x^n}dx+c_1x^n$, where $F_1(x)=\frac{1}{x^n}\int f(x)x^n dx+\frac{c}{x^n}$ Thus $C_x y=\int\left[x^n\int F_1(x)\frac{1}{x^n}dx+c_1x^n\right]dx+c_2$. Finally applying (2.1) we at once obtain $y=\int F_2(x)dx+c_3$, where $F_2(x)=\frac{1}{1-x^2}\int\left[x^n\int F_1(x)\frac{1}{x^n}dx+c_1x^n\right]dx+\frac{c_2}{1-x^2}$.

Concluding Remark : Using the technique employed in this work, one can easily solve any higher order linear differential equation when and only when the differential equation can be factorized by means of not only Bessel's operators but also my means of any number of first order ordinary differential operators.

Reference

1. Chen, Issac I.H and Barrett, T.W-Bessel's differential operators and application to linear defferential equations, Internet J.Math, Ed. Sci. Tech. 13 (1982), 149-153.

********** **********

********** **********

Shakespeare and cinema

Madhumita Majumdar [Lecturer in English]

The translation of a Shakespeare and text into a 'live' dramatic form be it a theatrical performance, film and television adoptation is not only a progressive movement but has mostly captured the imagination of the adience of all ages. Necdless to say, film and television productions have mostly found a place of potential value within the spectrum of literary education. In fact such adaptations have incorporated cotemporary elements. The recent adaptation of Macbeth in Vishal Bharadwaz's film 'Mia Maqbool' is but a reflection of what had been argued for just now.

Yet, the other truth is that imaginative interpretations of texts can be misleading also in film adaptations. The visual impact of film productions is often more stronger than the words of Shakespeare. In case of Macbeth, the scene where the witches await the arrival of Macbeth is visually much more stronger than the textual presentation or even when Macduff'son is murdered, the impact left in the film adaptation is much strong.

In the given light, the question that arises-Is the adaptation of Shakespearean plays in cinema to become part of our curriculum ? The answer is an overwhelming 'yes'. True, the Elizabethean theatre was more bare as far as stage props were concerned. Films on the other hand is the realisation of prospective stage crafting. Film adaptaitons relentlessly fill the mind with the visuals but it also encourages an interpretation or a defferent approach to the works of the famed playwright. The director of the film does duplicate the stage artifice and imaginative reality.

গল্প

ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যাথা ছোটো ছোটো দু:খ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

ঘোমটা প্রেম

মোঃ এনামুল হক
(বি.এ-প্রথম বর্ষ, ইতিহাস)

ডাউন বজবজ ট্রেন থামল টালিগঞ্জ স্টেশনে। অন্যান্য সহপাঠিদের সাথে মতিন ট্রেনে। কামরাটা চোখ বুলিয়ে নিয়ে যে যার জায়গামত দাঁড়ায়। রসিকতার মাঝে মতিন বুঝতে পারেনা তার সামনে সিটে বসা এক কালো বোরখা পরিহিতা ভদ্রমহিলার থেকে দুটি চোখবিষন্ন কিছু বলতে চাইছে। ভদ্র মহিলার সামনের বেঞ্চে একটি বছর তিনেকের বাচ্চা মেয়ে গুটি সুটি মেরে বসে রয়েছে আতঙ্কে। মতিন ভদ্রমহিলাকে একটু মুখের ঘোমটার পর্দাটা সরানোর অনুরোধ করল। ভদ্রমহিলা আলতো করে মুখের পর্দাটা সরিয়ে তাকিয়ে রইল মতিনের দিকে। হতবাক মতিন। বিনা মেঘে বজ্রপাত দেখার ন্যায় তাকিয়ে রইল মহিলার দিকে, মতিন বাচ্চা মেয়েটিকে বলল: দেখ মামন কি সুন্দর বউনা:, তোমার আর ভয় পাবে না তো ?.....

না:, আমার আর ভয় পাবেনা, বাচ্চা মেয়েটি বলতে বলতে হেঁসে ফেললেও মতিনের বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে কেঁদে উঠল.....। মতিন আর কোন কথা না বলে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সরে গিয়ে দাঁড়াল ট্রেনের ডান দিকের দরজার কাছে। হাওয়ার দাপটে এলোমেলো চুলগুলো চিরচলিতল্লসের ন্যায় এদিক ওদিক আছাড় খাচ্ছে কোন রহস্যের কিনারা পাবার আশায়। নিস্তব্দ মতিন। অন্যাণ্য যাত্রীদের সাথেও ভদ্রমহিলা তাকিয়ে রইল মতিনের দিকে, কিছুক্ষন আগে এই রসিক ছেলেটির হঠাৎ থমকে যাওয়ায়।

প্রতিদিনের মতো আজও তিনটে আটচল্লিশের ট্রেনে উঠেছে মতিন ও তার কলেজ ফেরত বন্ধুরা। রোজকারের মতো আজও তাদের বদল হয়নি তাদের কামরা। ওরা ট্রেন থেকে নেমে গেট পার হয়ে বাঁদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে। ঐ কামরায় প্রতিনিয়ত অফিশ ফেরত যাত্রীরা ও অপেক্ষায় থাকত কখন ঐ ছেলেগুলো উঠবে আর ওদের রসিক গন্ধ শুনবে।

চলন্ত ট্রেনে যে যার গল্পে ব্যস্ত থাকলেও মতিন বাচ্চা মেয়েটির কয়েকটি ভীতিপ্রদ কথায় মতিন তাকিয়ে ছিল বাচ্চা মেয়েটির দিকে। কালো বোরখা পরিহিতা ভদ্রমহিলাকে দেখে বাচ্চা মেয়েটি তার বাবকে বার বার জিজ্ঞেস করছিল-ওটা কে বাবা ?

ওটা একটা সুন্দরি বউ।

আমি দেখব বউটাকে বাব।

না, নতুন বউ তাই দেখতে নেই.....।

কেন বাবা, আমার যে ভীষণ ভয় করছে.....

তুমি চুপ করবে। মেয়েটির বাবা এক সময় ধমক দিয়ে উঠল ছোট মেয়েটির অসহায় মুখ চুপ করে গেলেও তার হৃদয়ের সরল প্রশ্ন কিন্তু চুপ করে থাকে নি। নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে বাচ্চা মেয়েটির কটি মুখে তার হৃদয়ের প্রশ্নের রেখা ফুটে উঠেছিল। এক সময় ভয়ে আড়ষ্ট বাচ্চা মেয়েটির দুচোখ বেয়ে পানি গড়াতে লাগল কি নিষ্ঠুর মহিলাটি। যদি একটু মুখের ঘোমটা সরিয়ে বাচ্চাটিকে মুখটা

দেখায় তা হলে বাচ্চাটির কান্না থেমে যায়। কিছুক্ষণ ইতস্তত: করে আর থাকতে না পেরে মতিন ভদ্র মহিলাকে অনুরোধ করেছিল একবার মুখের ঘোমটার পর্দাটা সরাতে।

মতিন না বুঝতে পারলেও বোরখা পরিহিতা সিতারা মতিনকে ট্রেনে উঠতে দেখেই টিনতে পেরেছিল, সেই পুরনো সাথীকে যাকে নিয়ে সিতারা শত কাল্পনিক স্বপ্নের জাল বুনেছিল যা বাস্তবে পূরণ হয়নি। ভরা বর্ষার ঝরা বৃষ্টির নির্মল আকাশে সাতরাঙা রামধনুর ন্যায় যৌবনের উষালগ্নেই বুকের আকাশে মেলে ধরেছিল মতিনকে নিয়ে সাতরঙা স্বপ্ন। চিরগ্রাসী সূর্যের ন্যায় উদিত হল সিতারার জীবনে আপন মামার ছেলে। বছর খানেক আগে সিতারার বিয়ে হয়েছে। দেওর সফি আবার মতিনের বন্ধু। বিয়ের পর আর মতিনের সাথে দেখা হওয়াতো দূরের কথা বগিত চার বছরের প্রেম পর্যায়.... প্রথম দর্শন, প্রেম, সেই...ই সাক্ষাৎ। তারপর মতিনের আর কোন দিন দেখা দেয়নি। সমস্ত সম্পর্কটাই চিঠির আদান-প্রদানের মাধ্যমে...। সিতারার যত বিবাহের সম্মন্ধ এসেছে সবই প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু যখন নিজের মামা মাকে মামাতো দাদার সাথে বিবাহের পাকা কথা দিয়ে যায় তা আর প্রত্যাখ্যান করার পরিবেশ ছিল না সিতারার। এ ঘটনা মতিনকে জানানোর পরও মতিন কোন উদ্দ্যোগই নেয়নি, নিজের দূর্বলতা, পড়াশেষ করা ও সিতারার বিবাহ সম্মন্ধে উপদেশ মূলক চিঠিই দিয়েছে। সিতারার বিবাহের দিন উপস্থিত হয়েছিল মতিন। চলে আসার সময় মতিন নিজেই কথ দিয়েছিল মতিন। চলে আসার সময় মতিন নিজেই কথা দিয়েছিল বৌভাতে সফীর বন্ধু হিসাবে উপহার নিয়ে সিতারাকে দেখতে যাবে। কিন্তু সেদিনও মতিন উপস্থিত হতে পারেনি। অভিমানি প্রশ্ন নিয়ে বেড়াচ্ছে সিতারা, কিন্তু এ কি ? মতিন যে একটা কথাও বলল না। কি এত অন্যায় করল সিতারা ? মতিন এতই পর। প্লাটফর্মের সংস্পর্শে এসে পড়বে ট্রেন। নেমে যাবে মতিন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখের ঘোমটা টেনে চোখ বুজিয়ে নেয় সিতারা।

ট্রেন চলার ধিকিধিকি শব্দ, নানা প্রশ্নের সাথে ফুসফুসের জানলা দিয়ে উঁকি দিতে লাগল সিতারার বিবাহ দিনের স্মৃতি। সবে মৌলভী সাহেব তার বিবাহের রায় নিয়ে গিয়েছেন। শরীর তখনও চাদরে মোড়া, সাক্ষীরা তার ঘর থেকে বার হয়ে বরের সম্মতি নিচ্ছে। রোশনি কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে গেল। মতিন এসেছে। তার সাথে দেখা করতে চায়। সিতারা আকাশ থেকে আছড়ে পড়ে-রোশনি তুই আমাকে বাঁচা। মৌলবী সাহেবকে গিয়ে বল এ বিয়েতে আমার সম্মতি নেই। রোশনি তার মুখ চেপে ধরে। এমন কথা বলতে নেই।

রোশনি ওকে ছাড়া আমি কি করে বাঁচব.। ঘরে ঢোকে মতিন। কেঁদেই চলেছে সিতারা.। মতিন শুধুই সান্তনা দিয়ে এসেছে।

বৌভাতের দিন। নতুন বউ এর সাজে সিতারা বসে আছে সোফায়। সিতারা খুঁজে চলেছে মনের অলঙ্কারের উপঢৌকন। বেলা তিনটের পরও মতিন আসেনি। রোশনি বাইরে পা বাড়ায়। সফিকে দেখতে পেল। রোশনি মতিনের খোঁজ করতেই সফি বাঁদিকের সিঁড়িটা দেখিয়ে দিল। রোশনি উপরে উঠে দরজায় ঢোকা দিয়ে ঢুকে পড়ল।

টেপ চলছে। মতিন মুখ গুঁজে বসে রয়েছে। রোশনির আগমনে মতিন টেপ বন্ধ করে। হঠাৎ এভাবে কি ব্যাপার রোশনি ?

কথা বল রোশনি.....।

কিন্তু তুমি এভাবে..... একা। বাড়ির ভিতর যাওনি কেন মতিনদা। একটা বেদনাদায়ক গান চালিয়ে শুধু শুধু নিজের মনকে কষ্টতো দিচ্চই, তার সাথে সিতারা..... কেও কেন কষ্ট দিচ্ছ।

দয়া করে চুপ করো রোশনি আর নয়...

সিতারকে আমি কেন কষ্ট দিতে যাব, আমি কে সিতারার ?

তুমি কে ? একথা বলতে পারলে মতিনদা.... ? বলতে বলতে রোশনির চোখের গোড়া দিয়ে পানি বেড়িয়ে এল। রোশনি তুমি কাঁদছ কেন ?

না: এটা আমার কান্না নয় মতিন দা...., এটাই সিতারার আসলরূপ, ছি: রোশনি লোকে দেখে ফেললে এখন কি অবস্থা হবে বলো ? যাও তুমি জাননা সিতারা সিতারা এখন বিবাহিত। রোশনি অভিমানের সুরে বলে ফেলল তবে তুমি এই বিয়েতে এসেছো কেন। মতিন বলে উঠল আমি সিতারার বিয়েতে আসেনি আমি বন্ধুর দাদার বিয়েতে এসেছি। যাক যা হওয়ার হয়েছে এখন তুমি ভিতরে চলো মতিনদা। না:, রোশনি না বলে মতিন রোশনিকে ঘর থেকে বার করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ঘটনা জেনে আঘাতে জর্জরিত সিতারা কোনো দিন আশা করিনি মতিনের সঙ্গে তার দেখা হবে। কিন্তু আজ আবার সেই দেখা কাল হবে, মতিন কথা না বলে এভাবে অপমান করে সরে যাবে এ জ্বালায় সন্তোষপুর পৌঁছানো ট্রেন।

সমাপ্তি-

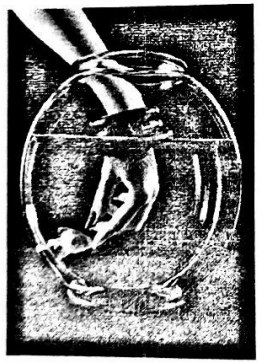

আকাশ কুসুম

সুজল পাল (বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ)

সন্ধ্যে যখন ঘনিয়ে আসছে হোস্টেলের বিছানায় শুয়ে জানালার বাইরে স্লেট রঙের আকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কুসুম. গেরুয়া রঙের পড়ন্ত বিকালের রোদ তীর্যক ভাবে ওর গায়ে খেলা করে যাচ্ছে, সারা মুখে ওর হেমন্তের পাতা ঝরা ঘোলাটে বিষন্নতা, আর চোখ গুলো ঢুলে আসছিল অঘোর ঘুমে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর মনে হয়, জীবনের পথ শেষ করা আত্মারা হয়তো ওখানেই থাকে। এমনই এক বিকালে কাঁচের পাত্রের মত ভেঙে চুড়মাড় হয়ে গিয়েছিল তার সব আনন্দ শুধুমাত্র একটা খবরে।

কুসুমের বয়স সতেরো বা আঠারো হবে, বাড়িতে বাবা মা উভয়েই চাকরিজিবী হওয়ার জন্য কুসুম ছোট বেলা থেকে এই হোস্টেলে পড়াশুনা করছে। হোস্টেলের যেন তার কাছে একাকী হয়ে উঠেছে, এই একাকী জীবনে তার সঙ্গ দিয়েছে শুধুমাত্র তার বন্ধবী প্রিয়াশা।

কুসুমের একটা শখ আছে সেটা হল কবিতা লেখা কুসুমের একলা সময়ের সাথী এই কবিতা। কুসুম সেদিন খাটে শুয়ে কবিতা লিখছিল আজ চাই তোমার ভালোবাসা

দাও আঁধার এই মনে আলোর আশা
নি:সঙ্গ এই জীবন পূর্ণ করো
কাছে এসে তুমি আমার হাত দুটি ধরো।

আর তখন মনে হল দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কেউ, কবিতা লেখার মুডটাই নষ্ট হয়ে গেল তার প্রিয়াশার আসার কথা নয় এখন। ওর দেরী দেখে আবার দরজায় ধাক্কা পড়েছে চুলটা একটু ঠিক করে দরজা খুলতে হল কুসুমকে। দরজা খুলেই দেখলো একটা বাচ্চার একটা চারকোনা বড় বাক্সে রঙীন কাগজে মোড়া একটা উপহার। ভাবলো ওটা নিশ্চই প্রিয়াশার হবে। কিন্তু বাচ্চাটা বলল "দিদি এটা তোমার, একটা দাদা আমার কাছে এটা দিয়ে বলল তোমায় দিতে। রঙীন কাগজটা ছিঁড়ে বাক্সটা খুলে দেখলো একটা লাল HEART বাক্সের ভিতরে একটা মোড়া কাগজ খুলে দেখলো লেখা আছে dear Kusum this is my heart don't break it.I love you. নীচে কোন নামও লেখা নেই কুসুম ভাবলো কে হতে পারে ! ফোনটা এল খানিক পরে ওপাশ থেকে কেউ বলল "গিফ্‌ট পেয়েছেন মিস্ ?"

"পেয়েছি, কিন্তু আপনি কে ? কেন গিফ্‌ট পাঠালেন ?"

"আপনি রেগে গেলেন নাকি ? গিফ্‌ট পাঠালেতো সব মেয়েই খুশি হয় !"

"কিন্তু কে গিফ্‌ট পাটাচ্ছে তাতো জানা দরকার"

"দেখুন মিস্ প্লিজ রাগ করবে না, আমি কোন খারাপ ছেলে নই, বরং আমি আপনার একাকী জীবনের সঙ্গ দিতে চাই"।

এবার কুসুম রেগে বলল "তাহলে আপনার নাম জানাচ্ছেন না কেন ?"

"সব বলবো, তবে এই মুহূর্তে একটু অসুবিধে আছে। শুধু একটা কথা, আপনি অত মন খারাপ করে থাকবেন না"

"থাকি বা না থাকি তাতে আপনার কি ?"

"আমি আপনাকে মানে তোমাকে ভালোবাসি আর তুমি মন খারাপ করে থাকলে আমার বুঝি ভলো লাগে ?"

রেগে ফোনটা রেখে দিলো কুসুম এই রকম ফোন কে করছে কে জানে ! আজ পর্যন্ত কেউ প্রপোজ করোনি ওকে, ও নিজে ছেলেদের এড়িয়ে চলে, আর যদিও করলো কেউ, সে নিজের নামটা বলছে না কেন ?

পরদিন আবার এল ফোনটা রিসিভ করতেই বলল "কি হল রাগ কমেছে ?"

"আচ্ছা লোকতো আপনি ! আমার রাগ কমরেঅ কিনা সেই ভেবে আপনার ঘুম হচ্ছে না নাকি !"

"আপনি কি করে বুঝলেন ? যার যার চিন্তা থাকে তার কিন্তু সত্যিই ঘুম হয় না!"

"ওরে বাব তাই নাকি ? " মজা করলো কুসুম।

" কেন আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না ?"

কুসুম বললো "ঠিক আছে না হয় বিশ্বাস করলাম", কিন্তু তোমার বলেই কুসুম জিভ কাটলো "মানে আপনার নামটা বললেন নাতো?" ফোনের বিপরীতে বলল "আমি আকাশ," আর পাশের কলেজের হোস্টেলেই থাকি। তোমাকে রোজ দেখি, কিন্তু কোন সময় কিছু বলে উঠতে পারিনি তাই উপহারটা পাঠিয়েই তোমাকে বলতে হল তার জন্য ***।

আকাশের কথা গুলো যেন কুসুমের মনকে স্পর্ষ করতে লাগলো, কুসুম আর নিজেকে রাখতে পারছে না, নিজেকে ও জানতো একটা একাকী মেয়ে বলে, দু-তিনটে শখ তার ছিল কিন্তু এ ব্যাপারটা প্রায় নেশার মত হয়ে দাঁড়ালো ওর কাছে। এর মধ্যেই মনে মনে সে ভালোবেসে ফেলেছে। যার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য কুসুম প্রতিক্ষা করে রোজ এভাবেই চলতে থাকলো দু-জনের ভালোবাসা।

প্রায় পাঁচ-ছয়মাস পরে তাদের দেখা করার দিন ঠিক হল আজকে। আকাশ ফোনে কুসুমকে বলেছিলো "আমি তোমায় ফোন করে ডাকলে তারপর তুমি বের হবে হোস্টেল থেকে। কুসুম বলল "ঠিক আছে" আজকে বিকালে কুসুম আকাশের সাথে দেখা করতে যাবে। সকাল থেকেই যেন ও অস্থির হয়ে পড়েছিলো কখন বিকাল আসবে, ভাবতে ভাবতেই দুপুর পেরোলে কুসুম পুরো রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কখন আকাশ আমায় ফোন করে ডাকবে। হঠাৎ ফোন এল। কুসুম ব্যস্ততার সঙ্গে ব্যাগের ভিতর থেকে বের করে সুইচ অন করে বলল "হ্যালো কে আকাশ ?" উত্তরে এল "না আমি আকাশের বন্ধু"।

তখন কুসুমের চেহারায় একটা হাতাশা এল। ভাবলো ফোন নম্বর আকাশের মোবাইলের কিন্তু ওর বন্ধু।

কুসুম বলল "আকাশ কোথায় ?"

আকাশের বন্ধু বলল "একটা খবর আছে"

কুসুম তখনো বুঝতে পারেনি যে তার ভাগ্যে দু:খ আছে। কুসুম জিজ্ঞেস করলো 'কি খবর'?

আকাশের বন্ধু বুঝে উঠতে পারছিলো না যে কথাটা কি ভাবে শোনাবে কুসুমকে কিন্তু তালে বলতেই হবে। অবশেষে স্ফিত কণ্ঠে বলল "আকাশ আর এই পৃথিবীতে নেই"!

কথাটা শুনে কুসুম আর নিজেকে সামলাতে পারলো না, ভীষণ মানষিক আঘাতে কুসুম কয়েকটা ঘুমের ঐষুধ খেয়ে হোস্টেলের বিছানায় শুয়ে বিকালের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে। প্রিয়াশাও খবরটা পেয়েঠিছল ।প্রিয়াশা ভেবেছিলো কুসুমকে শান্তি মাথায় বলবে কিন্তু প্রিয়াশা যখন দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো কখন দেখলো ঘরের সবকিছু এলোমেলো আর কুসুম প্রায় অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় ঘাটে মুয়ে, প্রিয়াশা কুসুমকে ডাকতেই কুসুমের শেষ নিশ্বাসে শুধু একটাই কথা ছিল।

"তুই আজ আমায় ডাকিলনা প্রিয়াশা আজ আকাশ আমায় ডাকছে"।

ভয়ঙ্কর

পার্থ সাধুখাঁ (বি.এ-কলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-৭১৯)

কোন রহস্য নয়, আবার বানানো গল্পও নয়। একে বারে সত্য ঘটনা, ভাবেলই বুক কেঁপে ওঠে। জগৎটা কত বৈচিত্রময়, কত অশুভ শক্তি ভর করে রয়েছে এর উপর। যার জ্বলন্ত প্রতিবিম্ব কয়েকটি উদাহরণ। এটা শোনা কথা নয়, কিম্বা রুপ কথার জগতের মত কল্পনা করা নয়। ঘটনার সূত্রপাত হচ্ছে একটা বেল গাছকে কেন্দ্র করে–যাকে হিন্দু সমাজে ব্রহ্মা হিসাবে পূজা করা হয়। পাড়া গাঁয়ের সবচেয়ে বিত্তশালী পরিবার-এর কর্ত হচ্ছেন অধীর সাধুখাঁ। বহুকষ্ট করে এক সময় তিনি অনেক টাকা রোজগার করেছিলেন। সংসারে দুই পুত্র সন্ত ান নিয়ে তাঁর বেশ সুখে সাচ্ছন্দে দিন কাটছিল। বেশ বছর খানেক পর থেকে তাদের উপর অন্ধকারের ছায়া পড়তে লাগল।

এর মূলে ছিল একটা বেল গাছ আর নিজেদের নির্বুদ্ধিতা যার জন্য একই বাড়ির চার চার জনকে ফুলের মত ঝড়ে যেতে হয়েছিল। হ্যাঁ সেই বেল গাছ। বেল গাছটা ছিল তাদের বাড়ির পশ্চিম দিকটায়। তাকে কেটে তার নীচে তৈরী হয় পায়খানার চেম্বার। ভাবতেও অবাক লাগে থাকে হিন্দু সমাজে দেবতার মত স্বরণ করে পূজা করে। সেই বেলগাছকে কেটে পায়খানার চেম্বার তৈরী করা হয় কোন যুক্তিতে। এর ঠিক দুই তিন মাস পর থেকেই ঘটনার সূত্রপাত শুরু হয়।

বাড়ির কর্ত অধীর সাঁধুখা গলায় দড়ি দিয়ে আত্ম হত্যা করে। এই মৃত্যুর কারণ কিন্তু আজও জানা যায়নি। বাড়ির কর্তার মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতে বাড়ির গিন্নী গায়ে তেল ঢেলে মারা যায়। সেই বিভৎস মৃত্যুর ছবি আজও চোখে মুখে ফুঠে ওঠে। বহু টাকার মালিক হয়েও কেন এরা আত্মহত্যা করবে, এর উত্তর তখন কোন পাড়া প্রতিবেশীর জানা ছিল না। বাড়ির বাবা-মা দুজনেই অশুভ শক্তির টানে মারা গেলেন। কিন্তু এখানেই ঘটানার শেষ নয়, বাড়ির বড় ছেলে প্রশান্তও একই ভাবে বাবার মত গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। না, মিথ্যে নয়, এক দমই সত্য, এর প্রমান কালিকাপুর সাধুখাঁ পাড়ার প্রত্যেক মানুষজন। এই মৃত্যুর কারন কিছুটা হলেও অনুমান করা যায়। সেই থেকেই পাড়ার প্রত্যেক মানুষ ঐ বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে ভয় পায়-কি দিনের বেলায় কি রাতের বেলায়। বাড়ির লোক আর বাড়িতে থাকতে চায় না, তারা সব সময় আতঙ্কে দিন কাটাতো। কিন্তু কেন এসব ঘটছে। ওঝাও আনা হল কিন্তু কিছুই হলনা। শোনা গেছিল ঐ বাড়ির ছোট ছেলে স্বপ্ন দেখেছিল ঐ বেলগাছে এক অশুভ আত্মা বাস করত। কিন্তু পরের দিন শুরু হল পায়খানা চেম্বার ভাঙার কাজ। এর পরেও তারা শান্তিতে থাকতে পারল না ওই বাড়িতে। এর পরই বাড়ির প্রত্যেকেই বাড়ি ছেড়ে পালাল। বেশ কয়েক বছর হল ঐ বাড়ি পরিত্যক্ত ভাবে পড়ে আছে। কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েও বাড়ির ছোট ছেলে মিশনে বসবাস করতে আরম্ভ করল। কিন্তু সেও রেহাই পাইনি, আগষ্ট ২০০৭-এ। সে আবার ঐ বাড়িতেই বিষ খেয়ে মারা যায়। তখনও কেউ জানাত যে ও কোথায় আছে। তিনদিন পরে ওর পচা দুর্গন্ধ দেহ উদ্ধার করা হল এই বাড়ি থেকে।

জানি না আর কাউকে টানবে কিনা। ওই বেলগাছ। তবে, এই বিজ্ঞানের যুগে এ-ধরনের ঘটনা সত্যই হাস্যকর। বাড়িটায় আজ নি:শব্দ অন্ধকার ও ভয়ংকরতায় আচ্ছন্ন। কারোর সাহস নেই যে রাতে ঐ বাড়িতে রাত কাটানোর। সত্যিই এটা একা "হান্টার হাউস"।

আজকের বিশেষ বিশেষ খবর

মোঃ হাবিবুর রহমান দফাদার (বি.এ, রোল-৭১৯)

১) আজাকের বিশেষ বিশেষ খবর হল, আজ সকাল ৭টা নাগাদ খাব আকাশে একটা বিমানের সাথে একটা মশার ধাক্কা লাগলে বিমানটিতেআগুন লেগে যায়। তবে মশার কোন ক্ষতি হয়নি বলে খবর পাওয়া যায়।

২) টাক চন্দনপুরে এখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষের টাকের উপর ধনে চাষ করা হচ্ছে। কৃষি জমির পরিমান কমে যাওয়ার এই অভিনব কর্মসূচি চালু করা হয়েছে বলে কৃষি মন্ত্রী ঢ্যাঁড়স দাস জানিয়েছেন।

৩) এই মাত্র সংবাদ পাওয়া গেছে বাংলা দেশে থেকে দু জন টেকো বর্ডার পার হওয়ার সময় টাকে টাকে ধাক্কা লাগলে এক জন ঘচনা স্থলেই মারা যান এবং অপরজনকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ডাক্তার জানিয়েছেন যে তাকে বাঁচাতে গেলে তার টাক কেটে বাদ দিতে হবে।

৪) বিখ্যাত চলচিত্র শিল্পি অভিনয় ঘোষ, আজ সকালে কলকাতায় তার বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি রেখে গেছেন দুটি বিধবা স্ত্রী , একটা পকেট মার ছেলে, এক বাণ্ডিল বিড়ি, একটা দেশলাই, প্রচুর ছেড়া চপ্পলএবং একট ভাঙ্গা ছাতা। তিনি দেশবিদেশের বহু চলচিত্র ও যাত্রার অভিনয় করে প্রচুর ছেড়া জুতো, ঢিল, ইট ও গালাগালি পুরুস্কার পেয়েছেন। তার মৃত্যু কালে তার বয়স ছিল ২কেজি ২৫গ্রাম।

৬) কেষ্টপুরের নষ্টমুর্খাজি আজ তিনদিন ধরে তার একমাত্র স্ত্রী শ্রী মতি গণ্ডগোল দেবিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে বাক্তি গণ্ডগোল দেবিকে খুজে দিতে পারবেন তাকে বৌ চুরির দায়ে ফাঁসি দেওয়া হবে।

৭) গতকাল মাঝরাতে বাংলাদেশ থেকে ৫০০ ছুঁচো সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেম করেছিল। এসন সময় একটা ইদুর দেখতে পেয়ে সীমান্ত রক্ষাবাহিনীকে সংবাদ দেয়। সীমন্ত রক্ষাবাহিনী 'ও' রাউণ্ড গুলি চালিয়ে ঐ ৫০০ছুচোকে নাক বুঁচো করে দেয়।

৮) আকাশ এই সাংবাদিক কচু ঘোষ জানিয়েছেন যে শিয়ালদহ থেকে একটা ভেড়ার বচ্চা ছুটতে ছুটতে বিদ্যাসাগর সেতুর সঙ্গে ধাক্কা মারলে সেতুটি উল্টে যায়।সঙ্গে সঙ্গে স্থানিয় কিছু মশা ও মাছি ঠেলে সেতুটি পুনরায় সোজা করে দেয়।

নষ্ট মেয়ে

সেরিনা খাতুন (বি.এ-তৃতীয় বর্ষ, রোল-১৭৯)

ছোটো থেকেই এ-পর্যন্ত দেবযানীর জীবনটা ছিল লড়াইয়ে পরিপূর্ণ। সে পিতা মাতার কাছে শুনেচে ছোট থেকেই তার অসুখ যেন তার সঙ্গ ছাড়ে নি। আজ সে বেশ বড়ো হয়েছে, দেখতে শুনতে বেশ ডাগর - ডোগর হয়েছে। আজ বাবা মা তার একমাত্র কন্যাকে নিয়ে শত অভাবের মধ্যেও দিন কাটিয়ে চলেছে। বাবাই তাদের সংসারের একমাত্র উপার্জন করার ব্যক্তি। প্রচণ্ড হাড়ভাঙ্গা খাটুানিতে অল্প যে বিঘে খানেক জমি আছে তাতে চাষ করে সংসার চালায়। মেয়েকে উচ্চ শিক্ষিত করে মানুষের মত মানুষ করে নিজের পায় দাঁড় করাবে এই ছিল বাবার একমাত্র স্বপ্ন। ঈশ্বর ও গরীব বাবার স্বপ্নকে জানতে পেরে তার আশীর্বাদ অভাগা চাষীর একমাত্র মেয়ের মাথায় ঢেলে দিয়েছিলেন, ১০বছরের এই ছোট্ট মেয়েটি পড়াশুনাতে ভাল, বুদ্ধি ও মানবিকতা দেখে অবাক হতে হয়। পাড়াপরশিরা বলা বলি করতো দেবযানি যেন গোবরে পদ্ম ফুল। পাড়ার কোমলপুর গার্লস স্কুলে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল। অল্পদিনেই স্কুলের ভালো ছাত্রী হিসাবে নাম করে ফেলে।

বাবা শত অভাবের মধ্যেও মেয়েকে জাগুলিয়াতে একটি টিউশান দেয়। টিউশানিতে পরিচয় দেবদাসের সাথে। সেও ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত তুখোর। দেবদাসের বাবার অবস্থা ভালো না থাকলেও সংসার একরকম স্বচ্ছলই চলে। পড়তে পড়তে তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের বাতাবরণ তৈরী হয়। পড়াশুনাতে একে অপরের সাহায্য নিয়ে থাকে। অনেক সময় দেবযানী টিউশনের টাকা জোগাড় করতে না পারলে দেবদাস ক্লাস ফ্রেন্ড হিসাবে টাকা দিয়ে সাহায্য করত। যদিও পরে দেবযানী মিটিয়ে দিত। পড়াশুনার ব্যাপারে দু-জনের বাড়িতে যেতে আসতে হত মাঝে মধ্যেই। এই সূত্রে দেবযানীর সঙ্গে দেবদাসের মায়ের পরিচয় হয়। দেবযানীকে দেবদাসের মায়ের ভালো লাগে। তাকে বৌমা হিসাবে ঘরে আনার মনের বাসনা নিয়ে দেবযানীর বাবার সঙ্গে কথা বলে। উভয়ই ছিল চ্যাটার্জী ব্রাহ্মন। ফলে রাজীও হয়ে যায়, বলে পরে ব্যবস্থা করা যাবে।

দেখতে দেখতে তারা আজ ক্লাস টেনে উঠল। পড়ার চাপ তাদের রীতি মতো বেড়ে গেছে। তাদের বাবা-মার মধ্যে ওই যে কথা হয়েছিল তা তারা জানতো না এমন রয়, কিন্তু তারা কিছুই ভাবেনি তা নিয়ে। তারা যেমন স্বাভাবিক বন্ধু তেমনই বন্ধুর মতো চলছিল। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও এই রকম বন্ধুর সহযোগিতাই দেবযানী পড়াশুনা নিয়ে বেশ ব্যস্তই ঠিল। বাবা যে কি হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সংসার চালাচ্ছিল সেদিকে সে নজরই দেয়নি কখনও। হঠাৎ বাবা কঠিন অসুখে পড়ল, সংসার আর চলছে না। অসুখ আর কিছুতেই সারে না। সংসারে যা কিছু ছিল একটা একটা করে বেচতে বেচতে শেষ সম্বল চাষের জমিটুকুও হাত ছাড়া হয়ে গেল। অন্তত মাস দুয়েক পরে বন্ধুর সাহায্যে ও মায়ের নিদ্রাহীন সেবাই বাবা সেরে উঠল। কিন্তু হ্যায় কখন যে বাবাকে সেবা করতে করতে কঠিন রোগটা মাকেই গ্রাস করে ফেলে ছিল তা কারোই নজর ছিল না। মাও সংসারের এই অবস্থা দেখে কাউকে কিছু বলেনি। একেবারে শেষ অবস্থায় এসে সবাই জানতে

পারে। কিন্তু ততদিনে সব শেষ, মা হঠাৎ একদিন রাত্রে সবাইকে ছেড়ে চিরবিদায় নেয়। এদিকে দেবযানীর সামনে পরীক্ষা এসে গেছে। সংসারের এই দৈন্য অবস্থা ও মায়ের পরলোক গমনে দেবযানী খুব চিন্তায় পড়ে যায়। দেবদাস অনেক বোঝানোর চেষ্টা করে প্রাইভেটে যেতে বলে, দরকার হলে টাকা সে দেবে। কিন্তু তাতে যেন দেবযানীর কোথায় যেন একটা বাধ বাধ ঠেকে। এছাড়াও বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সে দেবদাসকে বলে, "দেখ দেব তুমি একা প্রাইভেট পড়ো আমি কি করে তোমার সাহায্য নিয়ে পড়াশুনা করব।" অগত্যা দেবদাস তাই রাজী হয়। দেখতে দেখতে মাধ্যমিক পরীক্ষা এসে যায়, দুজনে পরীক্ষা দেয়, যথা সময়ে রেজাল্ট বার হলে দেখা যায় দেবযানী ফাস্ট ডিভিশন পেয়েছে, দেবদাস পেয়েছে ষ্টার। এতে যেন দেবযানীর দু:খের চেয়েও ভিতরে ভিতরে বেশ আনন্দ হয়। সে দেবদাসকে বলে তার রেজাল্টের পুরো কৃতিত্ব দেবদাসের এই উপকার কখন শোধ করতে পারবে না।

উভয়েই তারা একই স্কুলের কলাবিভগে ভর্তি হয়। ইতিমধ্যে দেবযানীর বাবা সুস্থ হয়ে পূবের অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু একদিকে স্কুলে অন্য দিকে সংসারের সব কাজসামাল দিয়ে উঠতে পারেনা। কাজ থেকে এসে সময়ে দুটো ভাত, এমনকি জল টুকু পায় না। দেবযানী অনেক চিন্তা করে দেবদা কে বলে তার বাবাকে পুনরায় বিয়ে দিলে কেমন হয়? দেবদাস বলে, "সে তো খুবই ভলো–যদি নতুন মাকে মানিয়ে নিতো পারো।" একদিন রবিবারে তারা দুজনে দেবযানীর বাবাকে বলে, "আপনি আবার বিয়ে করুন।" দেবযানীর বাবা নগেন চ্যাটর্জি হাসতে হাসতে বলে, "তোদের কি মাথা খারাপ হয়েছে, এই ৪০বছরে আবার বিয়ে। বরং তোমাদের দু জনের হাত দুটো এক করে দিয়ে ভালোই ভালোই বিদায় হতে পারলে বাঁচি আর কি।" দুজনেই কথাটা শুনে মুখ নীচু করে। কিন্তু দেবয়ানী পরে বাবাকে বলে, "এই প্রতিজ্ঞা করলুম বিয়ে তোমাকে করতেই হবে, নতুবা আর স্কুলে যাব না, ভাতও খাবনা।" অগত্য জেদি মেয়ের কাছে বাবাকে হার মানতে হয়। ওরা সুন্দর একটি ৩০–৩২ বছরের মেয়ের সাথে বাবার বিয়ে দেন। বাবার সংসার আবার পূর্বের মতো চলতে থাকে। কিন্ত সৎমা দেবযানীকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। আজ আর এক ভাই দুবছরের, মা পুনরায় সন্তান সম্ভবনা। সেবার দেবয়ানী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে, মনে হয় সেদিন শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসে শোনে মাকে ডেলিভারির জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অবস্থা খুব ভালো নয়, সঙ্গে সঙ্গে দেবদাসকে একটা খবর দিয়ে হাসপাতালে ছুটে গিয়ে শোনে মা একটা ফুটফুটে বোনের জন্ম দিয়েছে। মা আর বাঁচবে না। ঈশ্বরকে দেবযানি ডাকে। সদ্যজাত শিশুকে তার কোলে দিয়ে আমাকে ক্ষমা করিস, আমি আর বাঁচব না, তুই কথা দে তোর এই অনাথ ভাই বোনকে তোর ভাই বোন করে মানুষ করবি।। তুমি চিন্তা করো না মা, আমি এদের মানুষের মত মানুষ করে তুলবোই। দেবযানীর এই মুখের কথা টুকু শুনতে শুনতেই মা বিদায় নিল চিরদিনের মতো।

এ কি হল! মায়ের শ্রাদ্ধ বেশ ভাল ভাবে মিটল। কিন্ত বাবা গাঁ ছেড়ে দিয়েছে। শত ডাক্তার বদ্যি করে কিছুই হচ্ছে না, একদিন হঠাৎ ঝড় বৃষ্টির রাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে মেয়েকে

কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে রেখে দিয়ে চলে গেল। ক্ষণিকের মধ্যে সমস্ত দুনিয়ার অভাব, অশান্তি ও চিন্তার ঝড়, বৃষ্টি দেবযানীর ওপর এসে হাজির হল। একদিকে তার পড়াশুনা অন্যদিকে মাকে মৃত্যু শয্যায় কথা দিয়েছে ভাই বোনেদের কে মানুষের মতো মানুষ করে তুলবে।

দেখতে দেখতে উচ্চ মাধ্যমিক রেজাল্ট বার হয়েছে। দুই বন্ধুই ফাস্ট ডিভিসনের পাশ করেছে, কিন্তু দেবযানীর নম্বর কম থাকায় একই কলেজে তারা ভর্তি হতে পারে নি। ও দিকে ভাই ক্লাস ফোরে উঠেছে, বোনকে নার্শরিতে ভর্তি করেছে। পড়াশুনাতে যেন দুজনে হীরের টুকরো । দেবজানী ভাবে সে যেন তাদের কে ঠিক ভাবে গাইড করতে পারছে না। বাবার সম্পতি শেষ, তাই অনেক ভাবার পর সে দেবদাসকে বলে, দেবদাস কি সত্যিই তাকে বিয়ে করবে ? "হ্যাঁ, তোমাকে আমি জীবন সাথী হিসাবে ভেবে নিয়েছি। তবে এক কাজ করা যাক তুমি ভালো করে পড়াশুনা করো, সুযোগ পেলে ভাইবোনেদের একটু দেখাশুনা কর। আমি একটা চাকরিরর চেষ্টা করি।"

চাকরী খুজতে খুজতে কল্যানি থানার বড় দারোগার সাথে তার পরিচয় হয়। সর্ম্পকে সে দেবযানীর মামা। সে মায়ের দূর সর্ম্পকের ভাই মতো। দেবযানী তাকে তার সমস্ত দুঃখর কথা জানালে, "হ্যা তুই আমার সাথে চল। তোকে একটা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেব। আমার সাথে তাদের ভালো পরিচয় আছে।" সরল দেবযানী বিশ্বাস করে ফিরে আসে। মনের দিক দিয়ে সে যেন এরকম অসুস্থ। সাবাই বলে ফেরার ছিলি এতদিন, উত্তর দিতে তার যেন দ্বিধা বোধ করে। ভাই বোনেদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে তাদের দিদি চাকরি করে। দেবদাসও জানতে চাইলে বলে এইএকটা চাকরীর মতো আর কি। কিন্তু কিসের চাকরি বলতে রাজী হয় না।

একসপ্তাহ পরে মনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেহকে টেনে হিঁচড়ে কোলকাতাতে নিয়ে যায়। সকালে যায় আর সন্ধ্যাতে ফেরে। অল্পদিনেই সংসারের স্বচ্ছল অবস্থা ফিরে আসে। ভাই-বোনেরা কেউ বারো পাশ করেছে, কেউ মাধ্যমিক দিয়েছে। কিন্তু এমনও তারা কেউ জানতে পারে নি দিদি আসলে কি চাকরী করছে। রোজ সমাজে কত হিংস্র জন্তুর থাবা তাকে সহ্য করতে, কি নারীত্ব বাজী রেখে চাকরীতে তার নারী জীবনকে কলুষিত করে চলেছে। ভাই বলে, "দিদি আমি চাকরী পেলে তুই কিন্তু আর চাকরী করতে পারবি না।" বোন বলে, "দিদিকে তখন নতুন শাড়ি পড়িয়ে দেবদাস জামাই বাবুর ঘরোনি করে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দেব। দেবযানী কিছুই বলে না, আন মনে সে যেন কিছু ভেবেই চলে। শুধু একটু হাসে, সে হাসিতে যেন অন্য কিছু লুকিয়ে আছে যা শুধু ঈশ্বরই অনুমান করতে পারে।

দেখতে দেখতে চার বছর হল। বোনের একটি ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দিয়েছে। ভাইও চাকরী পেয়েছে। ওদিকে দেবদাসও চাকরী পেয়েছে। কিন্তু বিয়ের কথা বললে, "বলে তুমি অন্য মেয়েকে বিয়ে করে সুখে হও।" দেবদাস জেদ করলে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে যে তার চাকরী বেশ্রা পল্লীতে। তাকে জোর করে এক সপ্তাহ আটকে রেখে এভাবে এই পথে নামতে বাধ্য করিয়েছে। শেষে আত্মহত্যা না করে অনাথ ভাই-বোনকে মানুষের মতোন মানুষ করতে তাকে এভাবে বাঁচতে

হল। তাতে দেবদাস বিয়ে করতে রাজী হয়। দেবযযানী কিছুই বলল না। ভাই দিদিকে আর চাকরীতে যেতে দেয়না। দেবদাসের বাড়ির অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করে আশীর্বাদের দিন ঠিক হয়।

১৮-ই অগ্রহায়ন আশীর্বাদী। দেবযানীর ভাই খুব ধুমধাম করে আশীর্বাদীর সমস্ত ব্যবস্থা করে। আগের দিন ভাই দেবদাস জামাইবাবুকে বলে আমি তো একা তুমি কাল সকালে থেকে বন্ধু হিসাবে সাহায্য করো। সেই কথা মতো ১৮ই অগ্রহায়ন সকাল সাতটার আগে দেবযানীদের বাড়িতে এসে হাজির হয়। এটা করতে ওটা করতে ৮টা বেজে গেছে। লোকজন সব এসে গেছে। আত্মীয় স্বজোনেরা বাড়ি ভর্তি। কিন্তু কন্যা কোথায় ? এখানে কোঁজ ওখানে খোঁজ শেষে দেখা গেল চিলে ঘরটার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা। এত ডাকা ডাকি ধাক্কা ধাক্কি কেউ সাড়া দিচ্ছে না। জোর করে ভাঙতেই সবাই থমকে গেল এক ! এযে দেবযানী গলায় দড়ি দিয়েছে, আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু কেন ? দেবদাস সবই বুঝতে পারল। একটা চিঠিতে সমস্ত লিখে গেছে সে। সবাই পড়ল বুঝল, শেষে বলল "এমন নষ্ট মেয়ে থাকার থেকে না থাকা ভালো।" হ্যায় রে সমাজ !

জোকস্

দিপঙ্কর নস্কর (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৬১৬)

১) আমরা চার বন্ধু দিপঙ্কর, প্রসেনজিৎ, সুকান্ত, আর বিপ্লব। আমাদের মধ্যে বিপ্লব ছিল প্রচন্ড কৃপন। আমরা তিন বন্ধু বিপ্লব কে জব্দ করবো বলে যুক্তি আয়োজন করলাম। এক ২৫মে ডিসেম্বরের পিকনিকের জন্য ঠিক হল প্রত্যেক কে কিছু না কিছু না কিছু নিয়ে আসতে হবে।

যথারীতি ২৫শে ডিসেম্বর দিন প্রসেনজিত নিয়ে এল রুটি-মাংস, দিপঙ্কর এনেছে কলা, ডিম, লেবু আর সুকান্ত নিয়ে গেল ঠান্ডা পানিয় ও বিপ্লবকে দেখে সকলের চক্ষু স্থির সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে নিজের ভাইকে।

২) আমাদের চাঁদপুর গ্রামে মা চার মেয়ের বিয়ের জন্য ছেলে দেখতে গিয়ে বললেন–আমার মেয়ে নাচতে জানে, গাইতে জানে, সে অভিনয় করতে জানে, আবার গাড়ি চালাতে ও খুব পটু। তুমি কি জান বাবা ?– "আজ্ঞে আমি রান্না করতে পারি।"

'ভাই ফোঁটা'

রওসনারা খাতুন (বি.এ-তৃতীয় বর্ষ)

এই দিপু ওঠ সকাল সাতটা বেজে গেছে। মশাই এখন ও বিছানায় পড়ে রয়েছে। দ্বীপা এসে দিপুকে ডাক দেয়। কিন্তু দিপুর ঘুম থেকে ওঠার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। দিপু বিছানায় পাশ ফিরে ও পাশে যায়। দ্বীপা আবার এরস ডাক দেয়-কি রে উঠবি----------না ?

দিপু বিছানায় উঠে বসে, প্রতি দিনের মতো সেদিন ও দিপু দ্বিপাকে জিজ্ঞসা করে, "কি রে দিদি চা খাওয়াবি তো ?" দ্বিপা ছোট ভাই দিপুকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করে বলে, "আজ ভাই ফোটার দিন তুই তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে স্নান করে আয়। আমি ততক্ষনে তোর ফোটার ব্যবস্থা করি কেমন।" দিপুর মনে পড়ে যায় সত্যিই তো আজ ভাই ফোটার দিন। তার একটুও মনে ছিল না, যে তার দিদিকে প্রশ্ন করে, হারে দিদি তুই আজ ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য কি প্রাথনা করবি ? দিপা তাড়া দিয়ে বলে আবার ফাজরামি শুরু করেছিস যা তাড়াতাড়ি স্নান করে আয়।

দিপু তার দিদি দিপাকে ফোটার আয়াজন করতে বলে গামছা নিয়ে পুকুরের দিকে এগোয়।

দিপুর পোষা কুকুর টমি ও দিপুর পিছন পিছন এগোতে থাকে। দিপা ভাইয়ের ফোটার আয়াজনে ব্যস্ত থালায় চন্দন ঘষে রাখে। তার ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য একটা মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। দিপুর জন্য আগের দিন যে জামাটা বাজার থেকে কিনে এনেছিল, সেটাও সাজিয়ে নিয়ে বসে দিপা। অনেক দিনের সঞ্চয়ের পয়সা দিয়ে কেনা, জামাটা দিপুর গায়ে কেমান মানাবে, তাই হয়েছে দিপার ভাবনা।

ওদিকে পাশের বাড়ির সখির ডাকে দিপুর সব স্বপ্ন মুছে যায়। দিপাদি তাড়াতাড়ি এসদিপু পুকুরে ডুবে গেছে।মুহূতের মধ্যে দিপার মনে হল কেউ যেন তাকেচাবুক দিয়ে আঘাত করছে। একটা দমকা হাওয়া এসে দিপুর জন্য যে মঙ্গল প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে যায়, কিন্তু তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য। দিপা বুঝতে দিপু আর বেচেঁ নেই। দিপুর মৃত শরীরের উপর দিপা লুটিয়ে পড়ে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে দিপা, পাড়ার ডাক্তার বাবু মুন্না আসেন কিন্তু বৃথা, ডাক্তার বাবু নিরবে স্থান ত্যাগ করেন।

সকলে দিপুর মৃতদেহ সৎকারের জন্য শ্বশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে থাকে। সমস্ত আয়াজনের শেষে পাড়ার ছেলেরা যখন দিপুর মৃতদেহনিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে যায়, তখন দিপা চিৎকার করে বলে ওঠে, "না... না... না... তোমরা ওকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও না..., আমি যে ওকে এখন ফোটা দিই নি।" জল ভরা চোখে সব যাত্রীরা দিপুকে নিয়ে চলে গেল।

প্রকৃতির নিয়মে দিন আসে দিন যায়, অভিশাপ্ত সেই ভাই ফোটার দিনটিও ফিরেও আসে।

দুর দুর থেকে ভায়েরা আসে দিদির কাছ থেকে ফোটা নিতে। দিপাও দিপুকে ফোটা দেওয়ার জন্য সমস্ত আয়াজন করে শুধু দিপুর জন্য কিনতু দিপু- ও কি আর আসবে ?

এগিয়ে যায় মৃত দিপুর ফটোর সামনে ফটোর সামনে দাড়িয়ে দিপু বলে কিরে তুই এখনো দেরী করছিস স্নান করতে গেলি না ? দেখ আমি তোর ফোটার সমস্ত আয়াজন করে রেখেছি। যা তাড়াতাড়ি স্নান করে আয়।

দিপা দিপুর ফটোটা নিয়ে এসে আসনের উপর রাখে। আর তাতে ফোটা দিতে দিতে বলে--------ভায়ের কপালে দিলাম ফোটা, যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা।

ফোটা দেওয়া শেষ করে দিপুর জন্য আনা সেই জামাটা গায়ে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

দুরে মাইকের হর্নের আওয়াজ ভেসে আসে ভায়ের কপালে দিলাম ফোটা আর কি বেশি চাই-----?

ভালবাসার মিলন

মোঃ মনিরুল ইসলাম (বি.এ-তৃতীয় বর্ষ, রোল-৩৫)

এই গল্পের কাহিনী সেই সমস্ত নরনারীর, যাদের বুক ফাটে তো, মুখ ফোটে না। যাদের মনে প্রেম জাগে এবং প্রকাশ করতে না পেরে নিজ অন্তরে অন্তরে গুমরে গুমরে তুষের আগুনের ন্যায় জ্বলতে থাকে। যাদের মনে অবস্থা, শারীরিক ভাসা বুঝেও বুঝতে পারি না। কথায় আছে কথা কিছু কিছু বুঝে নিতে হয়, সে তো মুখে বলা যায় না। বাস্তব জগতে কিছু ছেলে মেয়ে আছে যারা নিজেদের মনের ব্যাথা, ভালবাসার ব্যাথা অপরকে অকপট বলতে পারে। কিন্তু কিছু ছেলে মেয়ে আছে যারা ভীত প্রকৃতির, তারা কখনো মনের কথা, ভালবাসার কথা, তার প্রিয় মানুষটির কথ অপরকে মুখফুটে বলতে পারে না। ফলে সে নিজেকে খুব অসহায় মনে করে, তার প্রিয় জনকে হারিয়ে নিজেকে আস্তে আস্তে শেষ করতে থাকে। এই সময় সে কাছে পেতে চায় এসন এক জন সাথী যাকে বন্ধুর মত পাশে এসে তাকে তার মনের সংকট থেকে উদ্ধার করবে। সেই তার আসল প্রকৃত বন্ধু। তার বন্ধু মনের অবস্থা বুঝতে পারবে এবং তার সমাধানের জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এই রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল দুই বন্ধু অসিত এবং রাজ এর মধ্যে। তারা দু জনে বাল্য বন্ধু, একই সঙ্গে স্কুল লাইফ শেষ করে কলেজ লাইফে প্রবেশ করেছে। কলকাতার একটি নামি দামি কলেজ সেন্ট পলসে তারা ইতিহাস অনার্স বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র। অসিতের বাবা একজন বড় ব্যবসায়ী। তার একটি ছোট ভাই আছে, অসিত একটু চঞ্চল প্রকৃতির ছিল, সে সকলের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা

করত। মেয়েদের সঙ্গে তার বেশ ভালো ভাব ছিল, অনেক মেয়ে তাকে ঘিরে সবসময় বসে থাকত। অসিতের নিজের দামি বাইক ছিল, অপর দিকে রাজ ছিল শান্ত, ভদ্র। বাবা একটা বেসরকারি চাকুরি করত। তার একটি বড় বোন আছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে বেশ ভালো পরিবারে এবং সে বাপের একটি মাত্র ছেলে। বাবা ছিল পরোপকারি, সে সকলের বিপদে আগে সামনে আসত। সকল সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করত। তাই সকলের কাছে সে প্রিয় ছিল, কিন্তু সে অনেক সময় মনের কথা বা ব্যাথা কাউকে বুজতে দিত না।

কলেজের প্রথম দিন থেকে রাজ এবং তার বন্ধু বান্ধব বেশ কলেজে একটা দাপট দেখাত। রাজ এবং অসিত তাদের লিডার হয়ে গেল। এসন সময় দুই তিন দিন কলেজ হয়ার পর রাজ ক্লাস থেকে বাইরে এসে কলেজের মেন গেটের সামনে একটি মেয়েকে দেখল। বেশ সুন্দরী, তাকে দেখে রাজের ভাল লাগল, মেয়েটি বেশ অসহায় অবস্থায় দেখা গেল, রাজ এগিয়ে গিয়ে তার সমস্যার কথা জানতে চাইল। সে ইতিহাস অনার্স নিয়ে পড়তে চায়, আজ ছিল তার শেষ ভর্তির তারিখ এবং সিট ছিল মাত্র একটি। কিন্তু তার ২০০টাকা কম পড়েছে। সে ফেলে এসেছে সম্ভবত। তখন রাজ নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু মেয়েটি নিতে অস্বীকার করে, জানা নেই চেনা নেই, কেন সে তার কাছ থেকে টাকাটা নেবে। তখন রাজ তাকে তার বন্ধু বলে মনে করতে বলেএবং বন্ধুর বিপদে বন্ধুর এগিয়ে আসা উচিত বলে সে মনে করে। তখন মেয়েটি গিয়ে ভর্তি হয়ে যায় এবং রাজের কাছে তার নাম প্রিয়া এবং তার সমস্ত পরিচয় দেয় এবং তাকে ধন্যবাদ জানায়। এই সময় অসিত আসে এবং তার সঙ্গে রাজ পরিচয় করে দেয় প্রিয়ার। তারা সকলে একটা টিমের মত কলেজে রাজ করতে থাকে এবং ক্যান্টিন, সিনেমা, আড্ডা মারতে থাকে। প্রিয়া সকল বন্ধু সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে থাকে এবং রাজের প্রতি তার একটা আলাদা অনুভুতি সৃষ্টি হয়। রাজও প্রিয়াকে মনে মনে ভালবেসে ফেলে। কিন্তু সে কখনোও বলতে পারে না, প্রিয়াও তাকে সে কথা বলতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে দুই জন এক জায়গায় হলে দুজনাই একটা শারীরিক অসহায় বোধ করে। বলতে গিয়েও আটকে পড়ে। এই বিষয়টি অসিত এবং তার অন্য বন্ধুরা বুঝতে পারে। তারা ভাল ভাবে জানত রাজ কখনো প্রিয়াকে তার মনের কথা, ভালবাসার কথা বলতে পারবে না। কারণ সে ছিল অন্য প্রকৃতির, কখনো রাজ কোন মেয়েকে ভালবসেনি, মেয়েদের সঙ্গে কখনো গভীর ভাবে মিশত না। তখন অসিত এবং তার বন্ধুরা তাকে প্রিয়ার ভালবাসার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলত তার মনে এমন কিছু নেই। সে প্রিয়াকে খুব শ্রদ্ধা করে এবং শুধু বন্ধু ভাবে। কিন্তু অন্য দিকে রাজ কথাটি চেপে রাখে। সে ভয় করত প্রিয়া যাদি তার ভারবাসা অস্বীকার করে, তাকে ভুল বোঝে। তাই সে প্রিয়াকে লেখা ভালবাসার চিঠিটা দিতে পারেনি। কিন্তু সে প্রিয়াকে হারাতে চায় না। তাই অনেক চিন্তা ভাবনার পর সে ঠিক করল যে সে আজ কথাটি প্রিয়াকে বলবে। কিন্তু সে তার বন্ধুদের কাছে জানতে পারে যে প্রিয়াকে অসিত ভালবাসে এবং প্রিয়াও তাকে ভালবাসে। তখন তার মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটল। তার দু চোখ অন্ধকার হয়ে গেল, সে নিজের ব্যথা কিভাবে লুকাবে বুঝতে পারল না। তখন কান্না হাসি মিশ্রিত

মুখে অসিত এবং প্রিয়ার কাছে গেল এবং দু-জনকে অভিনন্দন জানালো। সবাই যখন এক সঙ্গে বসে গল্প করে তখন দলের মধ্যে একটা অন্য মানবীক চিন্তায় উদাস হয়ে যায়। সে এমন তাদের দল বেধে কিছুটা মরে চলে যেতে শুরু করে। সে বাড়ি গিয়ে বিছানায় বালিশে মুখ গজে শুধু কাঁদতে থাকে। বাড়িতে চলেছে তার সেই পুরানো হাস্য মুখ যানা দেখা যায় না। তার বাবা-মা, বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে সে বলত তার শরীর খারাপ আছে আবহাওয়ার জন্য। এদিকে অসীত প্রিয়া এবং তার বন্ধুরা কোথাও যাওয়ার কথা বললে সে জরুরী কাজ আছে বলে চলে যেত। একদিন প্রিয়া জোর বারে অসীতকে সঙ্গে নিয়ে রাজকে ডেকে সিনেমায় যায় এবং রাত ৯টার সময় ঝড় বৃষ্টির রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অসীত জরুরী কাজের জন্য চলে যেতে চায় এবং সে প্রিয়াকে বাড়িতে পৌছে দেওয়ার জন্য বাবাকে অনুরোধ করে। প্রিয়াকে সেই রাতে ভিজে ভিজে বাড়ি পৌছে দেয় এবং তার বাবা মার অনুরোধ সত্ত্বেও ও সে প্রিয়ার বাড়ি থেকে বাড়ি ফিরে আসে। রাত পাঁচ ছয়দিন কলেজে আসেনী। তার পরদিন সে কলেজে গিয়ে শোনে যে প্রিয়ার সঙ্গে রাতের ঝগড়া হয়েছে প্রিয়া তিন দিন কলেজে আসেনি। প্রিয়ার এবং তার বন্ধুদের কাছ থেকে অসীতের খারাপ ব্যবহার শুনে সে অসীত কে খুব তিরস্কার করে। অসীত প্রিয়াকে বিয়ে করবে না। কারণ তার পরিবার প্রিয়াকে মেনে নেবে না। অসীত অনেক টাকার বর পন দাবী। সে ব্যবসা করতে চায়। মা প্রিয়ার বাবার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া অসীত অন্য মেয়েকে ভাল বসে অনেক দিন ধরে যা রাজ এবং তার বন্ধুরা জানতনা। রাজ বারবার প্রিয়া এবং অসীত মেলানোর চেষ্টা করে কিন্তু অসীত কিছুতেই প্রিয়াকে চায়না। তখন সব বন্ধুরা প্রিয়া এবং অসীতকে একা জায়গায় করে আলোচনা করে এবং রাজ প্রিয়ার ভালোবাসাকে গ্রহন করতে বলে। তার জীবনটা সুখে ভার দিতে বলে। অসীতের উচিত হবে না প্রিয়াকে দুঃখ দেওয়া। তাহলে প্রিয়ার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। তখন অসীত বলে, "তাহলে তুই কেন প্রিয়াকে ভাল বেসে তাকে না বলে নীজের জীবনটাকে আস্তে আস্তে নষ্ট করছিস। প্রিয়াও তোকে চালবাসে, সে আমাদের বলেছিল। কিন্তু তুই কেন বন্ধুদের বলিসনি তোর মনের কথা। তোর চিঠি আমরা তোর বাড়িতে গিয়ে পড়েছি। এবং আমরা জানতাম তুই কখনো বলবিনা। তাই আমরা বন্ধুরা তোকে জ্বালানোর জন্য এবং তোদের মেলানোর জন্য এই প্রেমের নাটক করলাম। আমরা প্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কেমন করলাম বলত ? "এইভাবে প্রিয়া এবং রাজ তাদের বন্ধুদের জন্য ভালবাসার মিলনের দ্বায়ে আবদ্ধ হল। প্রতিটি বন্ধু-বান্ধবীদের এগিয়ে আসা উচিত তাদের বন্ধুদের সাহায্যে।

কবিতা

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে
মুখ বুজে তাই সই সবি।

—নজরুল

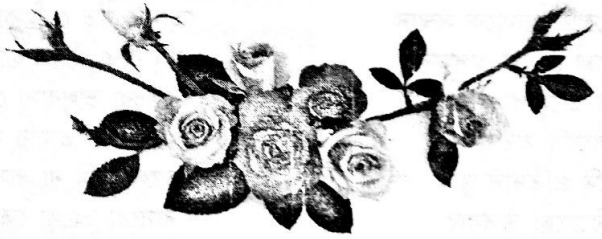

প্রেমের ঠেলা

মহাসিন মোল্যা
(বি.এ প্রথম বর্ষ, রোল-১৫৪)

প্রেমে ভীষন জ্বালা,
প্রেম যদি করেছ ভাই
বুঝবে কেমন ঠেলা
দুর থেকে মনে হয়
প্রেম অতি ভালো,
কাছে গেলে পারবে বুঝতে
প্রেমের রংটা কত কালো।
একবার যদি পড়েছ ভাই
এই প্রেমেরই কবলে।
জীবন তোমার শেষ হবে যে
এর বিষাক্ত ছোবলে।
তাইতো বলি প্রেম থেকে সদাই থাকো দূরে।
প্রেমে যদি পড়ো একবার
সুখ পাবেনা মরে।

ভালোবাসা

মো মোজাফ্যার মোল্যা
(বি.এ.দ্বিতীয় বর্ষ)

ভালোবাসা নামটি যেমন শুনতে লাগে মধুর
সবার জীবনে এটি লুকিয়ে থাকে মুস্টিমেয় দূর।
ষোল থেকে আঠারো হলে লাগে মনে ভালো
তখন সবার মনে আসে ভালোবাসার আলো।
সুন্দর আর ভালো হলে থাকে বহু কাল
মন্দ আর হ্যাংলা হলে ছেড়ে দেয় আজ।

পাষান হৃদয়

মো ফারুক হোসেন মোল্যা
(বি.এ.তৃতীয় বর্ষ,রোল-৭২)

তুমি নিষ্ঠুর তুমি পাষান
তুমি করেছো আমাকে শ্মশান
তুমি করোনি আমাকে সম্মান
করেছো কেবল অপমান
পবিত্র ভালোবাসা নিয়ে
গিয়েছি যতবার
দাওনি প্রতিদান তুমি
ফিরিয়েছো ততবার
যতবার জানিয়েছি আমি
আমার প্রেমের কথা
ততবার দিয়েছো তুমি
আমার অন্তরে ব্যাথা
তোমার মত প্রেমিকা পেলে
আমার এ জীবন হবে ধন্য
বুকভরা ভালবাসা কেবল
রেখেছি তোমার জন্য
ভালো তুমি না বাসলেও
বাসবো ভালো তোমায়
দূরে চলে গেলেও তুমি
কাছে থাকবো আমি।

পরীক্ষা

মোঃ মোজাফ্যার মোল্লা
(বি.এ.সাধারন দ্বিতীয় বর্ষ)

পরীক্ষা যে এসে গেল চিন্তা করে মরি।
ভাবছি এখন বিজ্ঞান টি কোথা থেকে পড়ি।
আর যে আছে ইংরাজীটা যত নষ্টের গোড়া।
উল্টোপাল্টা বানান সব,ফেল করবার সেরা।
ভূগোলটা যতই পড়ি থাকে নাকো মনে।
নম্বর সব যতই আছে বাংলার ব্যাকরনে।
আর যে আছে ইতিহাসটি যত সব গল্প।
পড়াশুনা না করলে নম্বর হবে অল্প।
অঙ্ক শাস্ত্র ভালো শাস্ত্র প্রাকটিস না করলে যা হয়
জ্যামিতির প্যাঁচে পড়ে যেটি হয় হায় হায়।
আর যে ঐ অর্থনীতি সংজ্ঞা সূত্রে ভরা।
বলতে পার কেমন করে পরীক্ষা দেব মোরা।

সেদিন

তুষার
(বাংলা বিভাগ,বি.এ.প্রথম বর্ষ,রোল-৯৭১)

যেদিন তোমায় খুঁজে পেলাম
অসংখ্য ভিড়ে, আলাদা করে, ভীষন চেনা....
আমি সেদিন থেকেই হারিয়ে গেছি, শুধু ধরা দিতে চেয়ে,
চোখের কোনের ভাষায় অনেক কথা বলেছি...
অনেকটা পথ ক্লান্তিহীন ভাবে পাশাপাশি হেঁটেছি
বৃষ্টিতে ভিজে মেঘলা আকাশ হয়েছি
রোদ্দুর গায়ে মেখেছি
শীতের পাতা ঝরার মত ঝরেছি
বসন্তে নতুন উষ্ণতার হাত বাড়িয়েছি...
শুধু তোমারই কাছে
বারে বারে ধরা দিতে চেয়ে।

শ্বশুর বাড়ী

পিনাকি মন্ডল
(তৃতীয় বর্ষ, রোল-১৯২)

আর যেখানে যাওনারে ভাই
সপ্ত সাগর পার।
ঘন ঘন শ্বশুর বাড়ী
যেওনা খবর দার।
শ্বশুর বাড়ী ভারী মজা
নতুন জামাই বলে,
পুরনো হলে বুঝবে রে ভাই
জামাই কাকে বলে।
প্রথম প্রথম দেখতে পাবে
সবার মুখে হাসি,
তার পরেতে দেবে তোমায়
খেতে সবই বাসি।
মনে মনে ভাবতে তখন
একাই ভালোই ছিলাম।
কলি যুগে কেন আমি
বিয়ে করতে গেলাম।

দুঃখ

প্রিয়াঙ্কা মন্ডল
(দ্বিতীয় বর্ষ ,রোল-৫১৫)

দুঃখ নিয়ে থাকি আমি
দুঃখ আমার হাসি।
দুঃখ দিয়ে গড়া জীবন,
দুঃখ ভালো বাসি
দুঃখ আমার কাঁদা হাসা
দুঃখে আমার বাঁচা
দুঃখ আমার জীবন সাথী
দুঃখেই যাওয়ার আশা।

ভবিষ্যৎ জগৎ

মোঃ এব্রাহিম আদম
দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-১৬ (বিভাগ)

আমি জানিনা এই জগতের শেষ কোথায়,
কিন্তু জানি আমার শেষ কোথায়।
তীর হতে তার নিশানা নিক্ষেপ করিলে,
সে নিশানা আর ফিরে আসে না।
হয়তো আমিও এই নিশানায় হারিয়ে যাব,
হারিয়ে যাবে আমার দুকুল।
সময়ের দন্তে হারিয়ে যাবে আমার বিশ্বাস,
হারিয়ে যাবে আমার নিশ্বাস।
তখন এই জগৎ আমায় করবে পরিত্যাগ,
তবু আমি ভুলবোনা এই জগতের রুপ।
যে কুৎসিত রুপের জন্য আমি ভুলে গেছি,
ভবিষ্যৎ জগতের রুপ-শান্তি মহাসমারোহ।

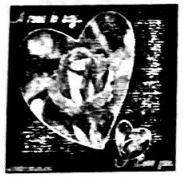

ভালবাসা

সাদিয়া খাতুন
[ক্লাস-বি.এ.সাধারণ, রোল-৩২২, দ্বিতীয় বর্ষ]

জীবনের পথে চলিতে চলিতে
ভালো লাগে কত কিছুতে
ভালোবাসা হয় ভালোবাসা থেকে
যদি মিল পাওয়া যায় কিছুতে
ভালো তো অনেক লাগে জীবনে
হয় না তো ভালোবাসা
মুছে যায় তাজা প্রান
কত মিষ্টি মুখের ভাষা
ভালোবাসা হয় মধুর
যদি রাখ আপন অন্তরে
তাও হয়ে যায় বিশ কত
দুষ্ট মনের মন্তরে
মন্তর শুনে কত প্রিয়জন
ভুলে যায় ভালোবাসা
হারিয়ে যায় আরো কত কিছু
আরো কত সুখের আশা ॥

বিদায়ের ক্ষনে

সুজাউদ্দিন মোল্যা
(বি.এ [সাধারণ], তৃতীয় বর্ষ, রোল-৩২)

বিদায়ের ক্ষনে পড়ে আছে মনে
দু-দিনের মেলামেশা,
নয়নের বারি রাখিতে না পারি
মুখে নাহি আসে ভাষা।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি তোমার প্রাণে
ব্যাথা দিয়ে থাকি কভু,
আছি এলগনে নিয়ো নাশে মনে
ক্ষমা করো বারে তুমি।
মিলনের রাত হল যে প্রভাত
তবু কি মিটিনি আশা ?
কিবা হেরিলাম আর যা পেলাম
তুলনা হইার নাই।
যদি রাখো মনে অথবা স্মরণে
আর কিছু নাহি চাই,
আসিবে সুযোগ হবেযোগাযোগ
আবার আসিবো ফিরে।

চাষী

শ্রী রণজিৎ সরদার
[বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-৭৭৭]

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষী।
ভারত মাতার মুক্তিকামী, ভারতের সে যে আশা।
বাল্মিকী কি ইহার চেয়ে সাধক ছিল বড় ?
পুন্য অত হবে নাকো সব করিলে ও জড়ো।
মুক্তিকামি মহাসাধক, মুক্ত করে মাতৃভূমি,
সবাই কে সে খাদ্য যোগাই, নেইকো গর্বশেষ।
ব্রত তার পরের মঙ্গল, নাহি চায় সে নিজে,
রৌদ্রে দাহ তপ্ত শরীর, মেঘের জলে ভিজে।
আমরা ভারতমাতার কিশোর ছেলে করি নমস্কার।
তোমার দেখে চূর্ণ হোক সকল অহঙ্কার।
তুমি মোদের সবার সর্দার, তুমি মহাপ্রান।
তোমায় দেখে চূর্ণ হোক ভন্ড নেতাদের মান।

দু:খ মোর সাথী

তাজমিরা পারভীন
(বি.এ.-তৃতীয় বর্ষ)

দু:খের মাঝে আমার
পাই নি সুখের ধারা,
দু:খ মোর সঙ্গী নিত্য
আমি যে সর্বহারা।
দু:খের মাঝে জন্ম আমার হাসি,
দু:খ নিয়ে থাকি আমি
দু:খ ভালোবাসি।
দু:খের মাঝে জন্ম আমার
দু:খ আমার সুখ,
শত দু:খের মাঝে তাই
কাঁপে না আমার বুক।

প্রতীক্ষা

সেখ জাহাঙ্গীর হোসেন
[বি.এ-ইতি,-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল১০৩]

শৈশব থেকে আজও আমি রয়েছি
কোন এক অচেনার প্রতীক্ষায়,
যদি তুমি বলো সেই অচেনা কে ?
কেনই বা তুমি তার প্রতীক্ষায় ?
উত্তরটা অবশ্যই জানি না।
যদি বলো তাহলে কেমন করে তার প্রতীক্ষায়
সেটা জানি.....
প্রাত: ভ্রমনের পথে আমি তার প্রতীক্ষায়
শান্ত সকালে চুমুক দেওয়া চায়ের কাপে
আমি তার প্রতীক্ষায়।
পড়ন্ত বিকেলে স্কুল ফেরাদের দলে
আমি তার প্রতীক্ষায়
প্রতীক্ষায় থাকি সন্ধ্যের দখিনা বাতাসে
ঘুমন্ত রাত্রির স্বপ্নে স্বপ্নে,
প্রতীক্ষায় থাকি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা আর
ঘুন ধরা অবক্ষয়িত সমাজের মাঝে,
অথবা উন্নত সভ্যতার রাজপথে।
শাল পলাশের ঢাকা অরণ্যের মাঝে
উপজাতি সমাজের অগ্রগতির মধ্যে
আমি থাকি তার প্রতীক্ষায়।
প্রতীক্ষায় থাকি যুগ-যুগান্তরে হারিয়ে
যাওয়া তার না ফেরা পথের বাঁকে।
জানিনা আমার এ প্রতীক্ষা শেষ হবে কিনা।
তবে এটা জানি
জন্মান্তর বলে যদি কিছু থাকে
সেখানে আমি থাকবো তার প্রতীক্ষায় ॥

'জলন্ত চিতা'

বাপি মন্ডল, (বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ)

একের পর এক স্মৃতির কাঠে;
স্বপ্ন গুলো সাজিয়ে তটে;
আশার অগুনে জ্বলছে মিতা,
ভালোবাসা আজ জ্বলন্ত চিতা।
একদা যে বীনা বাজল সুরে;
তার ছিঁড়ে আজ সে গুমরে মরে;
অন্তঃক্ষীরনে রক্ত ঝরে,
আজ কেবা তার হিসাব করে।
সুখ নামের সুখ পাখিটা;
পেলনা বাসা হারিয়ে দিশা;
প্রবল ঝড়ে পাক খেয়ে মরে,
ভরসা নতুন আশা।
তবু বলব ভালোবাসার মিতা,
শুধুই বলব ভালোবাসার মিতা,
শুধুই জলন্ত 'চিতা'।

তুমি

শশাঙ্ক মন্ডল, বাংলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

ভাবিনি তুমি কবিতা হতে পারো।
আমি নই নবী, আমি নই কবি
রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে, ঘুম ভেঙে যায়
কোন অস্ফুট বেদনায়
না বলা কথা
প্রথম দেখা
শুধুই অস্ফুট ব্যাথা
শয়নে স্বপনে
কিংবা জাগরনে
ফিরে ফিরে আসে
শুধু তুমি তুমি তুমি।

স্বপ্নের পরী

রাকিব আহমেদ তরফদার,
(বি.এ-তৃতীয় বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রোল-৫৩)

আমার মন ছোটে, সেই নীল আকাশের মাঝে
যেথা স্বপ্ন পরীর দেশ।
যেথা আমি খুঁজি, সেই স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা।
তাকে প্রথম স্বপ্নেই দেখি আমি।
যখন রাতে ঘুমিয়ে আমি পড়ি।
তখন তারে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ি।
কিন্তু এখন হয়না দেখা তারে।
মনযে আমার ব্যর্থ হয়ে ফেরে।
তারে আমি খুঁজে পেতেই চাই।
আবার ভাবি, তারে কি করে যে পাই।
রাত পেরোয় সকাল হয়ে আসে।
স্বপ্ন তখন মিঠেল রোদে হাসে
জানি স্বপ্ন কোন দিন বাস্তবে হয়না,
এই কথা আমার মনে যে সয় না।

শুভ কলেজ

মোঃ ইয়াজর রহমান আনছারী
(বি.এস.সি-প্রথম বর্ষ, রোল-১১০)

কলেজ মানেই পৃথিবীর স্বর্গ
বিশ্ব শান্তির সারি
কলেজমানেই পড়াশুনার সাথে
অসভ্যতার সঙ্গে আড়ি।
কলেজ মানেই বন্ধু-বান্ধব
নয় স্যার-ম্যাডামের সঙ্গে দ্বন্দ্ব।
কলেজ মানেই খেয়াল খুশি
পিরিয়ড নয় বন্ধ।
কলেজ মানেই শিক্ষার পীঠস্থান
শৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিবেশ
কলেজ মানেই আনন্দের প্ল্যার্টফর্ম
নতুন আবহাওয়ায় প্রবেশ।
কলেজ মানেই ইডেন উদ্যান
সু-শিক্ষার জগতে ধাবা
কলেজ মানেই অজস্র খুশি
যে যার মত ভাবা ॥

বিশ্বসেরা ক্রিকেটার

রানা অধিকারী, (বি.এ-তৃতীয় বর্ষ, রোল-১৬৩)

ভাঙছে রেকর্ড
গড়ছে শচীণ।
ব্যাটে মারছেন ছয়,
দশ হাজার রানের অধিকারী
করেছে কত সেঞ্চুরী।
বলটি হাতে এলে তাঁর,
করবে কিলিং বোল্ড।
অল রাউন্ডার অনেক আছে
শচীন সেতো নয়।
ব্যাটে ভেল্কী দেখায় তিনি
অফে মারে ছয়।
ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ ফসকায় না ক্যাচ।
স্ট্রাইক রেট আছে ১০০
খেলায় তিনি একাই একশো।
তাঁকে নিয়ে মাতামাতি
দর্শকদের হাতাহাতি।
পেপারেতে উঠেছে নাম।
মাষ্টার পেয়েছে নাম।

মনের ব্যাথা

কুমারেশ মন্ডল, (বি.এ-এডুকেশন, রোল-২৭)

সে দিনের কথা মনে পড়ে
যেদিন আমি এবং তুমি ছিলাম একই গাড়িতে,
সে দিন হয়েছিল কতনা কথা।
হয়েছিল দুর মনের ব্যাথা
মনেছিল কত আশা।
দুজনে বেঁধে দিলাম ছোট্ট একটা প্রেমের বাসা
কিন্তু ভাবিনি সে বাসা হবে তাসের ঘর।
হয়েছি যাতে তুমি এবং আমি চুড়মার।
জানিনা সেদিন আসবে কি আর
সেদিনে তুমি এবং আমি হব একাকার।

মার্জনা

শুভঙ্কর মন্ডল
(বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রোল৬৫৭)

অনেক ব্যাথা, অনেক দুঃখ
অনেক আঘাত অনেক কষ্ট সয়েছি
পেয়েছি ওতো কিছু কম নয়।
রুক্ষ বাস্তবের মাঝে
হয়তো আমি চিরদিন থাকবো না
অজানতে কিংবা জানতে অনেকের মনে
দিয়েছি অনেক ব্যাথা
তার থেকে পেয়েছি ওতো কিছু কম নয়
তাই আজ সকলের কাছে চাইছি ক্ষমা

বিচিত্র প্রকৃতি

মান্নান সেন, (বি.এ-প্রথম বর্ষ)

আমাদের এই খুব সুন্দর প্রকৃতি
যাব আমি তাকে ছেড়ে চলে
একটু একটু করে।
তাই যতদিন বাঁচব আমি,
করব উপভোগ এই প্রকৃতিকে নিয়ে।
প্রভাতকালের যে সৌন্দর্য্যময় প্রকৃতি,
সাদরে জানায় তাকে প্রনাম।
এই প্রকৃতিকে নিয়ে ঘেরা,
আমাদের সুন্দর জগৎ সংসার।
সবুজে সবুজে ভরা এই প্রকৃতি
পাখিতে পাখিতে মিষ্টি গানের সুর
মানুষে মানুষে হৃদয় ভরা ভালোবাসা
দেখতে লাগে ভারি চমৎকার।
চারিদিকের এই খুব সুন্দর প্রকৃতি,
চাইনা আমি তাকে ছেড়ে যেতে।
কিন্তু আমায় যেতে হবে
প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়মে।
বন্ধুদের জন্য রেখে গেলাম সহস্র ভালবাসা
আমার শুভাকাঙ্খি
আমার হিতাকাঙ্খি
সকলকে জানাই
তোমরা সুখে থাকো
এ অভাগার কথা মনে রেখোনা
এই রুক্ষ বাস্তবের মাঝে থেকে
আমি হয়ে যাবো বিলীন
আমার প্রেম হয়ে রবে শুধু স্মৃতি
আমি চাইনা
এ সমাজে বেঁচে থাকার স্বীকৃতি
জীবন খাতার প্রতি পাতায়
আকাঁছিল আল্পনা
সেই আল্পনা যেদিন কইবে কথা
সেদিন আমি হয়তো রইবো না।

আশা

মোঃ নবিউল ইসলাম মোল্যা
(প্রথম বর্ষ, রোল-৩৯৭)

থাকবো না কো চুপকরে পড়বো
এবার মন দিয়ে। হবো আমি
ডাক্তার সমাজ সেবা করবো
এটাই আমার প্রত্যয়।
গরিব দুঃখির মন করবো
জয় ! গরিবের মুখে ফুটবে
হাাস ! খুশি হবে জগৎবাসী !
আমরা সবাই ভারতবাসি
ভারত মা কে ভালোবাসি
তবে কেন থাকবো নাকো
গরিব দুঃখির পাশা পাশি
গরিব দুঃখি হলে খুশি।
স্বার্থক হবে ভারতবাসি।

নীরবে বিদায়

প্রসেনজিৎ দানিয়াড়ী
(প্রথম বর্ষ-সাধারণ, রোল-৫৩৯)

যদি কোনদিন ভালোবেসে থাকো
একটু খানির তরে আমায়,
তবে রেখে দিও আপন করে
তোমার ভাঙ্গা মনের আঙিনায়।
থাকবো আমি চিরকাল যে
তোমার কাছে হয়ে আপন।
পারবেনা কেহ ছিন্ন করতে
যদি না আসে মরন।
যদি তোমার স্বপ্নে আঁকা মন্দিরে
কখোনো যায় আগুন ধরে,
দেবে নাতো তখন আমায়
কাছে টেনে সরিয়ে দূরে।
সে দিন তমি হয়তো আমায়
দেবে পর কোরে,
সেদিন হতে আবার তুমি
জ্বালবে খুশির প্রদীপ অন্তরে।
হাসি মুখে তখন আমায়
তুমি যাবে ভুলে,
কাছে পাওয়া, ভুলে যাওয়া
এটা সবার মাঝে মেলে।
সেদিন তোমার সবকিছু রবে
শুধু ভুলে যাবে তুমি আমায়,
বলতে পারবোনা কিছু আমি
শুধু মন থেকে জানাবো নীরবে বিদায় ॥

বৃষ্টির স্মৃতি

কবিতা মন্ডল
(সান্মানিক বাংলা বিভাগ-প্রথম বর্ষ,রোল-২০২)

হোক না বৃষ্টি।
কি এসে যায় তাতে ?
আমি তো বেশ আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি
আর একটু কষ্ট করে কলেজ যাচ্ছি।
না গেলেও কিছু হবেনা।
শুধু একটু পড়ার ক্ষতি।
বৃষ্টি হলে তবু তোমার কথাতো মনে পড়ে।
মনে পড়ে শিলা বৃষ্টিতে, প্রচন্ড ঝড়ে,
সকলের বাধা এড়িয়ে-সেই কাল বৈশাখীতে
তুমি আর আমি, শুধু দুজন পরস্পরকে ভিজিয়ে,
চলেছি আম কুড়াতে।
তারপর আমাদের সাথে শুধু রাশিরাশি আম
আর পরিমানহীন বৃষ্টি ভেজা আনন্দ।
শুধু বৃষ্টি হলেই সেই সীমাহীন আনন্দের
কথা মনে পড়ে।
আরো মনে পড়ে কত মধুর স্মৃতি।
মনে পড়ে জনহীন বিদ্যাধরীর বুকে,
শুধু তুমি আর আমি,
নিরুদ্দেশের পথে চলেছি দুজনে বৃষ্টিতে ভিজে,
তুমি বাইছো নৌকা, আর আমি যেন বৃষ্টি ভেজা ময়ুরী।
আরো মনে পড়ে কত বৃষ্টি ভেজা স্মৃতি
যেগুলি শুধু তোমার আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ।
মনে পড়ে কত বৃষ্টি ভেজা স্বপ্ন ও বাস্তবের স্মৃতি
যেগুলি আর কোনোদিন ঘটবে না।
তাইতো বৃষ্টির সময় জানালার পাশে বসে
তোমার কথা মনে করি।
আসলে বৃষ্টির সাথেই জড়িত তোমার
আমার স্বপ্নময় স্মৃতি।
তাইতো চাই বৃষ্টি ঝরুক আরো আরো।
হোক না বৃষ্টি।
কি এসে যায় তাতে ?
বৃষ্টি হলে তবু তোমার কথাতো মনে পড়বে।

সাহসী

পলাস কুমার মন্ডল,
(বি.এ-সাধারণ, প্রথম বর্ষ, রোল–২৩৩)

আমি সত্য ন্যায়ের যুক্তিতে চলি,
মিথ্যারে আমি দুপায়ে দলি।
আমার হৃদয়ে নাই কোন ভয়
কোন বাধা আমি মানি না।
যাহারা আমার কাছে ফেরে,
দেখি তাহাদের আমি বারে বারে।
তাহাদের মন করিবারে জয়,
চাতুরীর ফাঁদ পাতিনা।
আমাকে তোমরা মনে কর ছোট,
আমার পাশেতে সদা এসে জোট।
তোমাদের দেওয়া সমালোচনায়।
হইনাকো দুর্বল।
জীবনে আমার আছে বড়ো সাধ।
যদি বিধি কভু নাহি সাধে বাদ।
দেশের জন্যে সঁপে দেহ মন,
প্রাণ হবে উজ্জ্বল।

কিসের এত ভাবনা ?

তুষার মন্ডল
(রাস্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ-তৃতীয় বর্ষ, রোল-৮৭)

সারাদিন শুধু ভাবি.....
কি ভাবি ? কেন ভাবি ?
আমার ভাবনার উৎস কি ?
আমার বুকের ভীতরটায় শুধু আশঙ্কা..
বুকটা ডিব ডিব করে ওঠে।
কি সেই ভাবনা, যা আমার ঘুম কাড়ে
জামা কাপড়ের ভাজ নষ্ট হয়.....
চুল এলোমেলো-নিদ্রাহীন রাত্রি,
এফ.এম রেডিও চলে সারা রাত।
ভোর বেলা কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি।
তার পর আবার ভাবনা, কি হবে ভেবে ?
কিসের এই ভাবনা, দু-দিনের জীবন
তার মধ্যে এত ভাবনা, শুধু ভাবনার
জন্য।
এই তুমি আউট হয়ে যাও তো;
না আমাকেই দেখটি আউট করতে হবে।
মন ছাড়া আমি ভালোই হবে।
বালিশ ছাড়া বিছানা যেমন---
তুমি ছাড়া জীবন।

শুভেচ্ছা

জাহাঙ্গির হোসেন, (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৩৬৪)

আমরা ভুলি পুরানো দিনের
পুরানো সব স্মৃতি,
ভুলে যাই সেই ঘটনাপূর্ণ
অঘটনের দিন-রাত্রি।
সুনামি-বন্যা-ঝঞ্ঝারা সব
আর এসোনা দ্বারে,
বরাভয় সব মুছে ফেলেছি
হৃদয় দেওয়াল হতে।
সবার জীবনে জ্বলে উঠুক
নব বছরের বাতি
নতুন বছরের জানাই সবারে
শুভেচ্ছা ও প্রীতি
সবার জীবন রেঙে উঠুক
শুভ নববর্ষে
তুফান হয়ে ভেঙে ফেল সব
জয় হোক নব হরষে ॥

দেশের নেতা

মোঃ গফুর আলি মোল্যা

ভোট দিন ভোট দিন ভোট দিন দাদা
এবার ভোটে জিতলে রাস্তায় হবে না কাদা।
গ্রাম গ্রামে জ্বলবে আলো দেব জলের কল
বেকারদের চাকরি দেব হাসপাতালে ফল।
কলকারখানা খুলবে আবার সবাই কাজ পাবে
যেখানে চলে না মানুষ সেখানে রাস্তা হবে।
আয়রে তপন আয়রে স্বপন আয়রে ভাই কালু
কেরাসিনের দাম কমাবো কমবে পটল আলু।
রেলের ভাড়া বাড়বে না আর ধরবেনা পুলিশ মদ খেলে
চুরি করলে মারবেনা কেউ, থাকতে হবেনা জেলে।
তোমরা সবাই শুনে রাখ শোন আমার কথা
তোমাদের আর চিন্তা কিশের আমি দেশের নেতা।

আশা

মোঃ হাবিবুল ইসলাম
(বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল৭৮২)

অনেক আশা নিয়ে জন্মেছি আমি
জানিনা কতটা পারব তা সফল করিতে
সকল পাখির কলরব যেমন ঘুম ভাঙ্গায় সবাই
আমি তোমার ঘুম ভাঙাবো অন্ধকার থেকে
দেখবো আলোর পথ, পিছিয়ে পড়া মানুষের ॥
যারা শুধু নিজের কথা ভাবে,
ভাবিনি একই মায়ের পরে থাকা অন্য সন্তানটির কথা
যারা সমস্ত কিছু দেখে ও চোখ বন্ধ করে থাকে
তাদের মানুষ বলতে ঘৃণাকরে আমর।
পৃথিবীতে সকলের তার সকাল আমরা,
এটাই মানুষের ধর্ম, আসল পরিচয়।
এই হল আমার আশার শেষ পরিচয় ॥

লক্ষ্য

সামিউল্লা খাঁন

আসিবে যখনই বান,
ধরিবে শক্ত করে হাল।
ছাড়িবেনা তারে ছিড়িবেনা তারে,
লক্ষ্য আসিবে নিশ্চিত পারে।
দূর্বল করনা কখনো মন,
তাকে বোঝাও বুঝিয়ে দাও,
পরাজয়কে জয় করতেই হবে,
শূন্যে জয়ের ধ্বনি তুলতেই হবে।
ঘুমিয়ে থেকোনা তুমি,
নীরব অন্ধকারের মধ্যে,
বেরিয়ে এসোর তার বেড়াজাল থেকে,
লক্ষ্য আসিবে নিশ্চিত পারে।
দীর্ঘ প্রত্যাশা না করে।
এগিয়ে চলো সামনের দিকে।
বাও শক্ত করে ধরে রাখ হাল,
লক্ষ্য আসিবে নিশ্চিত আগামি কাল।
অন্ধকারময় দিনে,
কখনোই যেওনা নিজের,
লক্ষ্য থেকে সরে।
জয় অবধারিত।
লক্ষ্য ছুটে আসবেই,
ওই দিগন্ত পার করে।

ধুয়ে যাক

ফারুক আহমেদ, (দ্বিতীয় বর্ষ-বাংলা বিভাগ)

কৃষ্ণ চূড়ার গায়ে রঙ ঢেলে দেব–লাল
রাধা চূড়ার গায়ে রং ঢেলে দেব –হলুদ
আকাশের উদারতা ঢেলে দেব তোমার চোখে–
বৃস্টি ঝরুক
ধুয়ে যাক আসমুদ্র হিমাচল
ধুয়ে যাক সম্রাজ্যবাদ–আশোক থেকে আকবর
ধুয়ে যাক তোমার-আমার ইতিহাস।

তোমাকে

পার্থ মন্ডল (স্নাতক, রোল-৩৮২)

কবিতা, আজ গদ্য–
জীবন কি বড় বেশি আশা করে ? জানিনা
অনুভব, তোমাকে ভালবেসে
শুধুই বেদনা,
তবু বেদনা,
তবু ভালবাসি,
কেননা, হৃদয় যদি ভালবাসার সঙ্গে আপস করে
তবে, আমি কি করতে পারি ?
তাই, হৃদয় ভেঙে দেখ
পরতে পরতে তার
প্রেমে পূর্ণ
এবং যদি পারো নিজেকেও ভাঙো,
নিজের ভাঙা আয়নায়
অন্যের ছবি দেখ–
দেখবে, রক্তের রঙ লাল হলেও
হৃদয়ের রঙ সবুজ,
তাহলে, মৃত্যুর নীলে ভয় কেন ?
তাই, আকাশ যদি ডাকে সাড়া দাও,-
বৃষ্টি যদি স্পর্শ করতে চায়
নিজেকে ছেড়ে দিও পৃথিবীর কোলে
প্রকৃতি ভালবাসবে–
তোমাকে ॥

রুম্পা

দীনেশ মুখার্জী (সান্মানিক স্নাতক, ইংরাজী)

রুম্পা,
তুমি স্বাধীনতা পিপাসু এক নারী,
হয়তো বাংলা অভিধানে না থাকা
কোন এক বিশেষ্য পদ তুমি,
তোমার তুলনা হয়তো কেবল তুমিই !

রুম্পা,
হয়তো তুমি আজ স্বপ্নবাসবদত্ত
অধরা এক বাগ্‌দত্ত নারী তুমি,
এলো চুলে লুটিয়ে পড়া স্রোতস্বিনী
মরুর মাঝে অবাধ্য মরীচিকা !

রুম্পা,
হয়তো তুমি লিখতে বসার প্রেরণা,
মেঘবালিকার আদর ঘেরা নাম,
স্বপ্ন আর কুয়াশা তোমার বাসভূমি
হৃদয় মাঝে কুলভাঙ্গা ঊর্মি !

রুম্পা,
তুমি স্মৃতিমন্থন করার নাবিক,
দেহমনের ক্লান্তি শেষের দিশারি,
হয়তো কেউই নও তুমি
কবিতার মাঝে ধরা দেওয়া অশরীরী !

বন্ধু

রমেশ মন্ডল, (বাংলা অনার্স)

সময় চলে যায় আশে না আর ফিরে,
স্মৃতি রেখে যায় চিরদিনের তরে।
পথে চলতে চলতে কখনো যদি হয় দেখা,
মনে পড়ে কী অতীতের ফেলে আশা কথা।
পড়ার সাথী গল্পের সঙ্গি মনের সাথী তুই
বলে ছিলি খাবিনা ভুলে।
আবার আমরা এক হয়েছি বন্ধুত্বের মায়াজালে।
হয়তো আমরা হারিয়ে যাব!
এই বিশাল পৃথিবীর কোন খানে।
যেখানেই থাকুক কঠিন বেড়াজাল,
অন্য গ্রহের বাসিন্দা হলেও,
মুখ ফিরিয়ে বলিস বন্ধু
কেমন আছিস তুই।

মনের মাঝে তুমি

তাপসী বাগ, (দ্বিতীয় বর্ষ, শিক্ষা অনার্স, রোল-৫৮৮)

জানি না তুমি আছো কোথায় এই বসন্তে
মন যে মানে না আর তোমাকে চায় জানাতে।
চলে গেলে তুমি স্মৃতি টুকু রেখে মনেতে আমার
মরুভূমির মাঝে যেমন মরিচিকা,তেমন আশার।
ভুলিনি আমি তোমায় রেখেছি মনের মাঝে
সর্বদাই তোমায় রেখেছি মনের মাঝে
সমুদ্রের বুকে বালুরাশি আছে যেমন,তেমনি তুমি আছো
আমার হৃদয়ের অসীম আকাশে ধ্রুবতারার মতো।
নদী যেমন পারেনা থাকতে মোহনাকে ছেড়ে
তেমনি আমি ছুটে যাই তোমার কাছে বারে বারে
জানি তুমি আছো আমার স্বপ্নের আঙিনায়
রাখবো চিরদিন মনের মাঝে শুধু আশার।
শরৎ এর আগমনে যেমন সুরভি পদ্ম ফোটে দিঘিতে
তেমনি তুমি মিশে আছো মনেতে আমার নিজের অজান্তে।
তুমি যতই থাকো দূরে দূরে আমি রইবো তোমার কাছে
তুমি বুঝেও বোঝনা রেখেছি আমি তোমাকে মনের মাঝে।
কথা দিলাম কখনো হবেনা পর, তোমাকে আমি
জীবন পথে থাকবে আমার মনের মাঝে তুমি।

প্রেম পৃথিবী

সাহানি হাবিবা,
(বি.এস.সি, প্রথম বর্ষ, রোল-৯৯)

আমি তোমার জন্য লিখব কবিতা,
যত দিন আমি বাঁচব পৃথিবীতে,
আমি তোমার জন্য গাইব জয়গান,
যতদিন আমি থাকব ধরনীতে,
আমি তোমার কথা ভাবব চিরদিন,
যত দিন আমি মোর থাকবে দেহে প্রান।
আমি ভুলবনা তোমাকে কোনদিন,
আমার জীবনে তুমিই আনন্দ আশ্রম।
আমি পথ চেয়ে থাকব শুধু বসে,
যতদিন মোর থাকবে দৃষ্টি চোখে,
জীবনের সব ব্যাথা বেদনা গুলি
মনের মাঝে রাখব শুধু লিখে,
চলার পথে তোমাকে পাশে নেবো,
জীবনের বাকি দিন কাটানোর আশায়।
কামনা আমি সব সময়ই করি,
ভরে যায় যেন পৃথিবীটা ভালোবাসা।

সেল ফোন

জালাল উদ্দিন আহম্মেদ (প্রথম বর্ষ, রোল-১০১৭)

হিং টিং টিং প্রশ্ন গুলো মাথার মধ্যে কামড়ায়
চট পট লিখে ফেলি নোটবুকের পৃষ্টায়।
সেলফোনে রিং টোনে ভরে যায় আড্ডা
মস্তানি আর রংবাজিতে দেয় এক ভাবনা।
ক্লাসেতে ও ডিসটাব করে দেয় মাঝে মাঝে
হঠাৎ সেলফোনে বেজে ওঠে রিং টোনে।
কারো কাছে সাদাকালো কারো বা রঙিন
তথাপিও সেলফোন হয়ে ওঠে সর্বাঙ্গিন।
ইংরেজি অক্ষর জানে না তো তন্ময়
তথাপিও সেলফোন অরবারে ফোনবারে পাটনায়।
চিঠি আর লিখতে তো হয় না যে প্রেমিকার
চলে আসে সেলফোনে ম্যাসেজের বার্তায়।
মাঝরাতে ঘুমভাঙে বেজে ওঠে সেলফোন
মিসকলে মিসকলে করে ফেলে জ্বালাতন।
এর পর আরো কিছু লিখতে যে মন চায়
কিন্তু পেনের কালি ঠিক তালেতেই ফুরিয়ে যায়।

শান্তি চাই

রাকিবুল ইসলাম,
(বি.এ-তৃতীয় বর্ষ, রোল-৭১)

আমরা শান্তি চাই, শান্তি চাই শান্তি চাই
আমরা চাই না যশ,
চাই না ধন,
চাই না ক্ষতি,
চাই শুধু নিরাপদ, শান্তির জীবন।
আমরা চাই না জ্বলতে বিভীষিকার আগুনে,
চাই না পরতে জঙ্গি হামলাতে,
চাই না জড়াতে রাজনিতিতে,
আমরা শান্তি চাই, শান্তি চাই, শান্তি চাই।

যাযাবর

শিবনাথ নস্কর,
(বি.এ-সাধারণ, রোল-৪৩৬)

আমি এক যাযাবর
ছেড়েছি নিজর ঘর।
পথকে করেছি আপন
ঘরকে করেছি পর।
আমি এক যাযাবর
আপন ছিল যারা।
ভুলে গেছে তারা
পর ছিল যে।
আপন হল সে
জানিনা একি খেলা।
খেলছে মানুষ সারা বেলা
ভুলছে নিজের কাজ।
হচ্ছে আড্ডা বাজ
আমি এক যাযাবর।
নেই কোনো ঘর
থাকি পথে পথে
আমি যাযাবর।

নেতার দল

জাহির হাসান, (বি.এ.-প্রথম বর্ষ, রোল-৩১৬)

চোর-ছেঁচড়া দেশের নেতা,
মারছে কত প্রাণ।
তারাই এখন মহান॥
এইতো হল নেতার দল,
এদের নাকি হয়েছে, নতুন করে মনোবল ?
গ্রীষ্ম-বর্ষা ধরে যারা করছে কষ্ট প্রানপন।
এদের কথা শুনলে পরে,
এদের আবার মাথা ধরে।
বিলেতী মাল না খেলে পরে
এদের আবার গলা ধরে॥
ইলেক্সন্ আসলে পরে,
এরাই আবার গাদা-গাদা কথা ছাড়ে।
এইতো হল নেতার কল।
এদের নাকি হয়েছে, নতুন করে মনোবল ?

একটি গাছ একটি প্রান

গোবিন্দ বিশই [শিক্ষাবিজ্ঞান (অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষ]

একটি গাছ একটি প্রান
এটাই হচ্ছে এখনকার শ্লোগান।
এটাই শুধু শ্লোগান হলে চলবেনা ভাই
সবার একটি করে গাছ লাগানো চাই।
গাছ দেয় মোদের খাদ্য, বাতাস
আমরা তাদের কেটে ফেলে করছি কেন নিপাট।
গাছ কেটে আমরা করটি বৃহৎ অট্টালিকা,
কারখানা।
যার ফলে বাতাসে বাড়ছে কার্বনডাই-অক্সাইড-এর
পরিমান।
কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়ার ফলে
বাতাসের ওজন স্তর যাচ্ছে চলে।
অধিক গাছ কাটার ফলে পৃথিবীতে বাড়ছে উষ্ণতা
উষ্ণতা বাড়ার ফলে মানুষের প্রান যায় যায়
অবস্থা।
উষ্ণতা থেকে পেতে গেলে রেহাই
সবার একটি করে গাছ অবশ্যই লাগানো চাই।

স্বপ্ন ভঙ্গ

সৌমেন পাত্র
(বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-৭০৬)

আমা রই ব্যথা ভরা প্রানে
লিখেছি কত কথা;
বুঝিতে পারিনি-গো তোমায়
কেন এত ছলনা।
তুমি যে আমায়
আপন করতে দিলে না;
মনে মনে ভেবেছি তোমায়
লিখে গেছি মনেরই খাতায়
এভাবে বলো না মুছে ফেলতে;
জানি দ্বিধা আছে তোমার
কত যে স্বপ্ন আমার
রয়ে গেল প্রানে তোমার।
বন্ধু ভেবে বিদায় জানিয়ে গেলে
তবুতো আপন করলে না;
আমি জানি তোমারই ছলনা
মনটা এভাবে ছিঁড়ে ফেলো না॥

বহুদূরে

সুশান্ত দাস (বি.এ.-প্রথম বর্ষ-এডু. রোল-১০৪৪)

এক দিন চলে যাব আমি বহু দূরে,
তোমাকে ছেড়ে।
কোন দিনও আসব না ফিরে,
তোমার ও তীরে।
আমাকে যতই ডাকো চিৎকার করে,
তাকাব না ফিরে।
এক দিন চলে যাব আমি বহু দূরে।
জানি তোমাকে ভুলতে পারব না,
ব্যথা পাব মনে।
তবুও তুমি যদি চাও মোরে ভুলে যেতে,
ভুলে যেও মোরে।
এক দিন চলে যাব আমি বহু দূরে।
জানি জন্মেছি যখন তখন মৃত্যু হবে,
ছেড়ে যেতে হবে এ মহাসুন্দর ধরণীকে।
ভুলে যেতে হবে যত আশা, আকাঙ্খা,
শুধু রয়ে যাবে প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা।
যত দুরনাম যাবে ভেসে কাল স্রোতে,
আমি পারবনা আমায় হৃদয় থেকে তোমাকে মুছিতে।
এক দিন চলে যাব আমি বহু দূরে।

প্রতিক্ষায় উপহার

সঞ্জয় পাত্র

(বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-৫৪৩)

বন্ধু,
ঠিকানার হাত ধরে
তোমাদের কাছে আশা;
শূন্য বুকে আছে আমার
প্রতিক্ষা আর একটু ভালবাসা।
ফেলে এসেছি মায়ের বাধন
কাগজের রঙীন ভেলা;
ভূলে গেছি সেই ছোট্ট বালিকার,
এককা দোক্কা খেলা।
উড়তে দেখা ফিকে হাওয়ায়
কালো চুলের মরু;
তোমার কাছে সে, বলতে চাওয়া
স্বপ্ন দেখা শুরু।
তারপর তোমার সাথে কত কথা
ক্যান্টিনের জানালার পাশে বসে;
কত শত স্মৃতি যেন,
ছবি হয়ে ভাসে।
আবার আমি এঁকেছি তাই
নতুন কত ছবি;
তোমার জন্য প্রতিক্ষায় আছে
বিদায় গোধুলি রবি।
এই ভাবে দিন গোনা শেষ হবে
প্রতিক্ষার পথ শেষ হবে শেষে,
শেষ উপহার নিয়ে যাব আমি
স্বতন্ত্র প্রেমিকের বেশে।

উপহার

আসান আলি মোল্যা (বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-১২)

বন্ধু চেয়েছি বন্ধুর মতো
বন্ধু পেয়েছি হৃদয়ের মতো
অস্থির সমুদ্র থেকে দিলে
জীবনের একটি উপহার
তোমার উপহার থেকে ঝরে পড়লো
বন্ধুর প্রতি হৃদয় ভরা ভালোবাসা,
উপহার থেকে ঝরে পড়লো
ভালোবাসার অম্লান চির অক্ষয়।
যদি বন্ধু ছেড়ে দূরে চলে যাই কোনদিন
তবু মনে রাখবো বন্ধুর দেওয়া উপহার।
যদি মনের গভীর হাতড়ে না পাই বন্ধুকে,
তবু মনে রাখবো বন্ধুর দেওয়া উপহারের স্মৃতি,
ছোট্টো হলেও বন্ধুর উপহার
তাই সারাটা জীবন এটি রাখব জমা হৃদয়ের গলিতে ॥

দুঃখ

মোঃ মনিরুল ইসলাম (বি.এ.প্রথম বর্ষ)

একদিকে বৃষ্টি বেশী
অন্য দিকে খরা,
একটি নদী শুকিয়ে গেলে
অন্য দিকে ভরা।
কারো হাতে ভর্তি টাকা
কারো হাত খালি,
কারো মুখে গালি।
কারো ছেলে হচ্ছে প্রথম
কারো ছেলে ফেল,
কারো সুখে নিদ্রা কাটে
কেউবা খাটে জেল।
একটি পাখি বন্দি খাঁচায়
অন্যদিকে বনে,
একটি প্রানে সুখের ছোওয়া
দুঃখ অন্য মনে।

ভূলে যেও না

অভিজিৎ মন্ডল

(বি.এ,দ্বিতীয় বর্ষ ,ইতি-অনার্স ,রোল-৭০৪)

প্রথম বছর শিক্ষা রত ভাঙ্গড় কলেজে
পরিবেশের সাথে মিলেগেছি বন্ধনের মায়াজালে।
পড়ার রিতি নিতি আর শিক্ষক শিক্ষিকার ভালোবাসা
থাকিবে আমার মনের অন্তরালে।
যখনি ভাবি যেতে হবে এ কলেজ ছেড়ে
তখনি মনের ব্যথা ক্রমে ফুটে ওঠে হৃদয়ে।
শ্রদ্ধেয় গুরুজন আর ছাত্র ছাত্রীদের জানিয়ে যাই
এই মনোরম পরিবেশের কলেজকে স্বরন রেখো।
কত রীতি নিতি স্বরন করিয়ে সবার
আমার মত ছাত্র শত শত আসবে আবার।
নবীনের সাথে এই কলেজ কে পরিচয় করিয়ে দিলাম
আমি প্রবীন হয়ে ভাঙ্গড় কলেজ কে জানাই হাজার হাজার প্রণাম।

গ্রাম্য মেয়ে

রতন অধিকারি

(বি.এ.প্রথম বর্ষ, রোল-৮২৭)

মালচঞর এই ছোট গ্রামে আছে একমেয়ে প্রিয়া
সত্যি কথা বলতে কি নেই কো তার হিয়া,
মুখেতে তার জড়িয়ে আছে সুমধুর মায়া
অনেক দুর থেকে দেখা যায় ভালোবাসার ছায়া,
মাঝে মধ্যে রেগে যায় অল্প কথাতে
সারা দিন বসেই থাকে নিজের বাড়িতে,
চোখ দুটিতে আছে তার প্রশান্ত দৃষ্টি
সে যেন ঈশ্বরের সুপরিকল্পিত নিখুঁত সৃষ্টি,
সাজ গোজ আর লিপিষ্টিকের নেইকো তেমন বাহার
বাবা মাকে শ্রদ্ধা করা এটাই তার কাজ
পরের সঙ্গে কথা বলতে লাগে তার লাজ,
সর্বদাই ব্যস্ত থাকে নিজের পড়াতে
এই ভাবেই তার দিন কেটে যায় সকাল সন্ধেতে।
জীবনে কোন দিন সে বাসেনি কাউকে ভালো
সবাই বলে সে নাকি এই পাড়ার আলো।
সর্বদাই মনে করতাম তারই নাম
কোন দিন আমার কথায় দেইনি কোন দাম।
ভালো থাকুক ,সুখে থাকুক এই কামনাই করি
তাকে যেন সারা জীবন ভলোবেসে থাকতে পারি।

যথা ধর্ম তথা জয় করলে ভুগতে হয়

দিপঙ্কর নস্কর (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৬১৬)

কর্মদোষে দোষী মানুষ ভগবান কিন্তু দোষী নয়
চিন্তা করে দেখ মানুষের কেন কষ্ট হয়
সর্ব্বপীরের আর ভগবান দিয়েছেন দুনিয়ায়
বৃক্ষ মাঝে যাকে পোকা সেওতো খেতে পায়।
দিবানিশি খেটে মানুষ কেন উপবাসী
গাধার মত খেটে মানুষ কাজের বেলা দোষী
সত্য মিথ্যা বলি আমি শাস্ত্র আছে দুনিয়ায়।
চিন্তা করে দেখ মানুষ কেন কষ্ট পায়।
নাম ধর্ম জাতের বিচার কাজের বেলায় ভিন্ন নয়
চিন্তা করে দেখ মানুষ কেন দু:খ কষ্ট পায়
যাত্রা কালে বাধা কিন্তু মনে চলতে হয়
মস্তকে বাধা কার্য সিদ্ধ বাতাস কয়
বহু বাধা বহু যাত্রা আছে এই দুনিয়ায়
পিতা মাতার স্মরণে কিন্তু যাত্রা শুভ হয়
সুখ দু:খ দুটি রাস্তা যাহার যহা খুশি
মানিলে হয় পাহাড় না মানিলে ভূষী
সময় বুঝে কর কাজ তার কৃপা পাবে
অসময়ে করিলে কাজ মিছে ফল হবে
যদি ধর্মস্থানে বা ব্যবসাস্থলে মায়ায় হাত দিয়ে বসে
দু:খ কষ্ট হয় তাহা দীপঙ্কর বলে
অমাবস্যায় যেসব স্থানে কালি পূজা হয়
সে পূজার জবা ফুল ঘরে রাখলে ঘরের শান্তি হয়
নরগণ আর রাক্ষসগণে মিলন হলে ভাই
মরণ ছাড়া এ জীবনে আর শান্তি নাই
এই পর্যন্ত করি বন্ধ আমি সকলেকে জানাই
নামটি আমার দীপঙ্কর নস্কর সকলে জানাই।

বিজন তটে

আবু জাফর মোল্যা,
(রোল-৯৩৭ ,বি.এ.প্রথম বর্ষ ,বংলা বিভাগ)

প্রশস্ত নদীর জল বহিয়াছে কল কল,
তারই বুকে ভেসে যায় দুই একটি দূর্বাদল।
বসিয়া আছি তটিনীর তীরে
পদযুগল সিক্ত করে স্রোত স্বিনীর নীরে।
শূন্য তীরে বনস্পতি আছে ঘিরে,
দুই একটি সাদা হরিন হরিনী আসিছে ধীরে।
নাহি জনকোলাহল শুধু দুই একটি ধীবরের দল
বারে বারে কানে ভাসে জলকল্লোল।
দেখিতে দেখিতে রবী গেল অস্তমিতে,
ভবিলাম এবার হবে ফিরিতে।
ধ্যান ভাঙিল চকিতে, কিসের শব্দএসে,
একি;এযে মনুষ্য ছায়া আসে গাঁ ঘেসে।
মন হারাইল জ্ঞান বুকে নাহি প্রান
মনে হইল যেন মৃত্যু আগমন।
তখোনো নদী বাহিয়াছে উল্লোড়ে আমি ডাকিলাম অস্ফুটস্বরে,
জানিনা সে শুনিতে পাইল কি না , থাকিল নীরবে।
মৌন থাকিলাম দু এক দন্ড হৃদয় আমার উৎকণ্ঠ ,
শেষে শুনিতে পাইলাম এক মেয়েলি কণ্ঠ।
একি এসে এক সুন্দর নারী ঝরিছে তার অশ্রু বারী,
মনে মনে ভাবি একনত কোন ছদ্দবেশী পরি।
জিঙ্গাসিলাম তুমি কে বালা, উতরিল আমি এক অভাগিনী বালা,
এই বিজন তটেই মোর বাস থাকি আমি একলা।

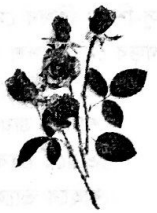

জন্ম ভূমি

মোনোয়ারা খাতুন [বি.এ (অনার্স) প্রথম বর্ষ]

শস্যে ভরা সবুজ খেতের মাঝে
সবুজ বাগান ঘেরা ঐ যে ছোট্ট গ্রাম
ও-টাই আমার জন্ম ভূমি
ওর নাম মাঝের হাট ॥
জন্মে আমি ওখানে পেয়েছি
ভালোবাসা
তাই ধন্য আমার জীবন
আর পূর্ণ মনের আশা ॥
ওখানকার সুন্দর মনোময় পরিবেশ
গায় শান্তি জয়গান,
তাইতো ওদেশ আমার প্রিয়
ও-যেন প্রানের প্রান।
ওখানে একে হয় অন্য জনের
বিপদে দেয় সাড়া,
ভালোবাসার ভিত্তি দিয়ে
আমার ওই জন্মভূমি গড়া ॥

আমরা ছাত্র

সোমনাথ মন্ডল [বি.এ-প্রথম বর্ষ]

আমরা যুবক, আমরা তরুণ
আমরা ছাত্র ভাই,
সু-শিক্ষা শিখব মোরা
গড়ব মোরা দেশ তাই ॥
গাইব সারা বিশ্বে মোরা
শান্তির জয়গান
ভরিয়ে দেব সত্যের আলো
বহিবে ভালোবাসার বাণ ॥
দেশের উন্নতি করব মোরা
থাকবে না কোন ভয়,
এই ভাবে এগিয়ে গেলে
আসবে মোদের জয় ॥
আমরা যুবক, আমরা তরুন
আমরা ছাত্র বাই-
সু-শিক্ষা শিখব মোরা
গড়ব মোরা দেশ তাই ॥

চলে যেতে চাই

তোসলিমা নাসরিন [বি.এ. অনার্স-প্রথম বর্ষ]

ধরনীর বুকে একদিন ফুটেছিল গোলাপ
দেখেছিলাম তাকে,
মুগ্ধ করেছিল মন ॥
দিয়েছিল কথা গেয়ে যাবে আমায়,
বিদায়ের শেষ গান।
বিদায় আরতি হাতছানি দিয়ে-
ডেকেনিল তার।
হল না আমার শোনা-
বিদায়ের শেষ গান ॥
থাকিতে চাই না আমি এ মধুর ভূবনে
চলে যেতে চাই আমি তোমার-ই স্বর্গে,
একত্র করিতে হৃদয় ॥
গর্বিত প্রাসাদে দেবতার স্থান নহে,
তোমা বিনা আমার স্থান পৃথিবীতে নহে।
চলে যেতে চাই আমি তোমার-ই স্বর্গে
একত্র করিতে হৃদয় ॥
স্বপ্নে দেখাও আমায় আছো যে স্বর্গে,
চলে যেতে চাই আমি তোমার-ই স্বর্গে
একত্র করিতে হৃদয় ॥

দুঃখ মোর সাথি

মোঃ মনিরুল ইসলাম [বি.এ-অনার্স- প্রথম বর্ষ]

দু:খের মাঝে জন্ম আমার
পাইনি সুখের ছোঁয়া,
দু:খ মোর জীবন সাথি
আমি সর্ব হারা ॥
* * *

দু:খের মাঝে জন্ম আমার
দুঃখ মোর হাসি,
দুঃখ নিয়ে জীবন গড়া
দুঃখকে ভালো বাসি ॥
* * *

দুঃখের মাঝে জন্ম আমার
দুঃখ মোর সাথি,
দুঃখকে সঙ্গে নিয়ে
করব সবার আপন আমি ॥
* * *

ভুলতে পারিনি তোমাকে

রতন অধিকারী

(বি.এ-প্রথম বর্ষ-সাধারণ, রোল-৮২৭)

আমি অনেক কিছু ভুলতে পারি
ভুলতে পারি ফেলে আসা সেই সব দিনগুলি
ভুলতে পারি বিস্মৃত সেই ইতিহাসের কথা ॥
আমি অনেক কিছু ভুলে গেছি এই পৃথিবীর রূপ-রেখা
শুধু ভুলতে পারিনি শ্রাবন্তি তোমাকে ॥
আমি ভুলে যেতে পারি তাকে,
যে আমাকে প্রথম পত্র দিয়েছিল ভালোবেসে ॥
আমি ভুলতে পারি আমার জীবনের ব্যর্থতাও সফলতাকে
শুধু আজও ভুলতে পারিনি তোমাকে ॥
আমার জীবনে এক দিন এসেছিলে শ্রাবন্তি তুমি
তোমার জীবনের গভীর আকৃতি ভরা মন নিয়া ॥
তোমার আদর ভালোবাসা আর মায়বি চোখের চাহনিতে
আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম তোমার হৃদয় গভীরেতে
সে সব আজ ও ভুলতে পারিনে
এই সব ভোলা যায় না ॥
তুমি চলে গেছো আমার ছেড়ে অনেক দুরে
তবু ও আমার সামনে শুধু তোমার স্মৃতি সর্বক্ষন ভাসে ॥

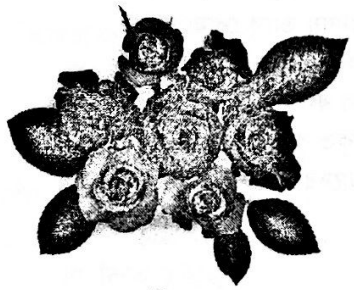

আমরা ফাস্ট ইয়ার

প্রভাবতী পাল

(বি. এস. সি,প্রথম বর্ষ, রোল-৯৩)

আমরা ফাস্ট ইয়ার,
সবাই সবার ইয়ার।
রয়ে যাবে চিরদিন
বন্ধুত্ব হোক যত ক্ষীণ।
করব সবাইকে কেয়ার,
আমরা ফাস্ট ইয়ার।
ভাঙ্গড় আমাদের কলেজ,
অনেকের আছে যে লেজ,
চুল তো নেই তাতে
তবু পারে নাড়াতে,
করুক সবাই পেয়ার
আমরা ফাস্ট ইয়ার।
বন্ধু আমরা পরস্পর,
কাউকে করব না পর।
সবাই সবার সমান,
করব না তো অপমান।
সবার জন্য একটি চেয়ার,
আমরা ফাস্ট ইয়ার।
বলি সবাই সাবধান,
হব এবার আগুয়ান।
রাখব কলেজের মান,
যায় যাক চলে প্রাণ।
থাকব সবাই সবার,
আমরা ফাস্ট ইয়ার।
করতে পারি মোরা জয়,
সে জয় একার নয়।
যদি মারি একটা ছয়,
হয়ে যাবে রাজ্য ময়।
করব আমরা একাকার,
আমরা ফাস্ট ইয়ার।

খোকন আমার

নিবেদিতা মুখার্জী

(বি, এ, দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-৫৩)

খোকন আমার সোপারে,
আমায় কি তোর মনে পড়ে না
বাদল ঘেরা কাজল দিনে
যেদিন গাছের পাতা পড়ে না
সেদিন কি মনটারে তোর কিছু করে না

আমি ডাকি খোকন খোকন
বাতাস বলে 'মা'
ওরে বৈশাখের ঐ চাতক পাখি
খোকন তোরে কিছু বলে না ?

কোল বিছিয়ে বসে আছি
পিঠে পায়েস পুলি সাজিয়ে
'মা' আমার খিদে পেয়েছে এখুনি পাতা বিছা"
অমন সোনার রাগ ছেড়ে তুই
কোথায় গেলি বাছা ?

আষাঢ় মাসের গঙ্গা যেমন
আমায় চোখে বয়
আঁধার ঘেরা মাঠের পারে
ও খোকারে করেনা তোর ভয় ?

সাতটি বছর বসে আছি
পঁচিশ বছরের পালা
ইস্কুল যাবি বড় হবি বিদায় দিবি
তোর সাথে ছিল খে জুড়ে
আমার জীবন মালা।

স্বাধীনতা

সমু (বি.এ.প্রথম বর্ষ, রোল-৪৪৪)

আজ মোদের স্বাধীনতা
আজ দিবে কেউ বক্তিতা
কেউ শোনাবে পড়ে কবিতা
তাই এটা নয় স্বাধীনতা
ভস্মে শুধু আজ ঘি ঢালা
লোক দেখিয়ে পতাকা তোলা
চারি দিকে কত হৈ চৈ
কিন্তু স্বাধীন ভারত হল কৈ
স্বাধীন ভারত সবাই অধীন
প্রকৃত স্বাধীন হয়েছে 'ক' দিন
সবাই জানে গড়তে স্বাধীন রাষ্ট
বিল্লবীরা করে ছিল কত কষ্ট
তা যদি নেতারা বুঝতো আজ
করত দেশের ভাল কাজ।
নেতাদের স্বার্থ আর দুর্নীতিতে
ভরে গেছে মোর সোনার ভারতে
তাই মরছে মানুষ কাঁটা-কটিতে
যেখানে নেই কোন নারীর মর্যদা
পণ প্রথা নিয়ে ঘরে ঘরে কাদাঁ
কিন্তু সংবিধানে নারী-পুরুষ সমান সর্বদা
গণতান্ত্রিক দেশে এক নায়ক তন্ত্র
পাটি হয়েছে ঝামেলার যন্ত্র
চাকুরির নামে ধর্ষণ
অন্যায় ভাবে বোমা বর্ষণ
বল মোরা সইবো কতক্ষন
বল বল বল সবে
প্রকৃত স্বাধীন হবে কবে
মোদের এই সোনার ভারতে।

জন্ম ভূমি

আবিদা খাতুন

(বি.এ.প্রথম বর্ষ, রোল-৬৩২)

ও আমার মমতা ময়ী মা,
কে দিল তোমায় এতো মহিমা।
কে তোমায় নরম বুকে,
সবুজের ছবি এঁকে,
ভরালো মায়ার দুনিয়া।
কে তোমায় নিপুন হাতে,
সাজালো নিখুত ভাবে,
কে দিল এতো রুপের ছটা।
যা দেখে মুগ্ধ হয়ে
ভুলে যাই পরকালকে,
মাগো তোমার রুপ দেখতে
সময় চলে যায়।
পরকালের কাজ করতে
সময় নাইকো পাই।
মাগো তোমার রুপের ছটায়,
বিভোর হয়ে যাই।
তাইতো পরম করুণা ময়কে,
ডাকতে ভুলে যাই।

নতুন পরিবেশ

মোঃ আসরা ফুল ইসলাম

(বি. এ. প্রথম বর্ষ, রোল-৯০৪)

নতুন নতুন পেলাম বন্ধু নতুন পরিবেশ
পুরানো সব ভুলে আছি আমি বেশ।
মনে মনে মন আমার পেত কত ভয়
নতুন জায়গায় কিজানি কিভাবে কী হয় ?
ভেবে ছিলাম মোরে কেউ করবে না বরণ
ছাএ পরিষদ ছেলেরা সবাই ডেকে বসাল পাশে
কি সুন্দর এদের মন।
অচেনা অজানা সবাই হলো মর জানা,
ভাবছি এখান হতে আর কোথাও যাবো না
শুরুতেই একসাথে করি মোরা প্রার্থনা।
সুন্দর চিন্তা ভালো এদের ভাবনা,
পারবো আমি সব ছাড়তে শুধু পারবো না
নতুন বন্ধু গুলো ও এই নতুন কলেজ খানা,
শ্রেষ্ঠ হবে এই ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়
ঈশ্বর পূর্ণ করবে এই আমার ভরসা।

কেড়ে নিল

আজিউদ্দিন আহম্মেদ (বি.এস.সি, প্রথম বর্ষ, রোল-৮৬)

আমরা ক্ষুদ্র জীবন থেকে,
তুমি কেড়ে নিলে,
তাই আজও-
জোনাকির মতো ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে
বেঁচে আছি তোমার অপেক্ষাতে।
জানি না তুমি আমাকে
কি দিতে চাইছো।
তবুও আজ আমি তোমার
মনকে কেড়ে নিতে পারেনি।
যেমন পারেনি আকাশের বুক থেকে চাঁদকে
যেমন পারেনি সাগরের বুক থেকে জলকে।
তেমনি পারেনি ভালোবাসার ছলনায়,
তোমাকে কেড়ে নিতে"
তাই আজও।

ম্যাগাজিনের দৃষ্টি

আব্দুল মারুফ গাজী
(বি.এ.প্রথম ইতি-অনার্স বর্ষ রোল-৬৬৯)

হঠাৎ দেখি পড়ে গেছে
ম্যাগাজিনের দৃষ্টি।
কি লিখব ভাই ভাবছিলাম
নাই কো চোখে ঘুম।
সকাল বেলায় পড়ায় কাটে
তার পরেতে স্কুল।
ছুটির পরে পেটের জালায়
সব হয়ে যায় ভুল।
সন্ধ্য হলে পড়তে হবে
আছে বাবার তাড়া
কখন লিখি কি যে হই সারা।
ভাবতে ভাবতে চোখের পাতায়
নেমে আসে ঘুম।
ঘুমে মাঝে স্বপ্ন দেখি
ম্যাগাজিনের দৃষ্টি।

সৃষ্টি

চন্দন সরদার (বাংলা আনার্স, প্রথম বর্ষ)

হৃদয়ের মনোবীনা হতে
বেরিয়ে এল নতুন নতুন তান
সৃষ্টি করল পাষান বুকে
মানবিকতার জীবন দান,
দিশেহারা মনুষকে তাই
ছন্দ কাব্যে বেঁধেছে,
আমাদের পত্রিকা আজ
নতুন সাজে সেজেছে।
এতে আছে নতুন লেখক
নতুন নতুন লেখা
বাস্তবিক কাহিনী আর
জ্ঞানের আলোর দেখা।
বন্ধু সকল ভুল করে এটি
পড়ো একটি বার,
সৃষ্টি মোদের সবার সেরা
তুলনা নেই যার।

কলি যুগের ধর্ম

নাসির আলি মোল্যা (বি.এ, প্রথম বর্ষ, রোল-৩১)

ধর্মের সাথে কাপুরুষতা
মানুষ ছাড়া কেউ করে না,
লোক মুখের সামনে তারা
ধর্ম প্রচার করে।
বেইমানি করে তারাই
ঐ নিজেদেরই স্বার্থে,
হিন্দু বলো মুসলিম বলো
একি রক্তে তৈরী।
স্বার্থের লোভে হত্যাকরিল
নিজের বাবা,ভাইকে,
স্বার্থের লোভে কেরে খালি
গরীবেরই রক্ত খানা।
ভোট দিয়ে সাহেব বানালি
গ্রামের এক দাদাকে,
সেই দাদা তোরি ঘরে শুয়ে
বুকে মারে ছুরি।
ধর্মে ধর্মে ছেয়ে গেল
কলিযুগের বুকেতে
ধর্মের নামে কত কি করলি
ধর্মের মান রাখলো না।

ভেদা ভেদ

আসুরা খাতুন (প্রথম বর্ষ)

কেন তাহা মানুষ কেন নানা রকম
প্রকার ভেদ?
কেউ বা পড়ে কোরান-বাইবেল
কেউ বা পড়ে গীতা-বেদ।
কেউ বলে জল-পানি
কেউবা ওয়াটার
কেউ বলে মা-আম্মা
কেউ বলে মাদার
বাচাঁর জন্য গ্রহন করি
আমরা খাদ্য,জল
একই পুকুরে-একই নদী
একই গাছের ফল।
কেউবা করে নামাজ-রোজা
কেউবা প্রার্থনা
যে নামেতে ডাকো বন্ধু
সে তো এক জনা।
হিন্দু হওয়া নয়রে দোষের
নয়রে মুসুলমান
একজন কে ভাগ করেছি
আল্লা-ভগবান।
যাত্রীমোরা একই গাড়ির
যাব নানা দিক,
দিনের বেলা এক সূর্য,
রাতে চাঁদের আলো,
সবাই যদি ভাগ করে নিই,
লাগে কত ভালো।
এই পৃথিবী সবার জমি ,
সবার বাড়ি,কেউ বা যাবে শ্বশ্মান ঘাটে
কেউ বা যাবে কবরে।

মোর ভালোবাসা

এম.এম. মোল্লা (বি.এ-সাধারণ)

ভালোবাসা জেগেছে মোর প্রথম জীবনেই
তাই লিখতে বসলাম তোমার ঠিকানাতেই।
প্রথম দেখাতেই সেই আশাতেই
দিলাম তোমায় মোর হৃদয়কেই।
তাই যদি পাই খুঁজে
মোর প্রথম প্রেমিকাকে,
সেই আমা ভরসাতেই
হারিয়েছি যে তোমার কাছেতে।
তুমি কি দিবে না সাড়া
মোর আশার জীবনটা গড়ার।
তুমি ছাড়া এ-জীবন এল যে কেন
শ্রমন করে কাটাই বা কয়দিন বলো।
ছিলাম তো একাই ভালো
কেনই বা দেখা দিলে বলো।
তোমার ঐ হৃদয়টা করো জ্বালিত
মোর এ জীবন হোক আলোকিত।
তুমিই যে মোর আশা আলো
এটাই তো মোর ভালোবাসা বলো।
শুধু একবার বলো ভালোবাসি
মোর এ-জীবন হোকগো ধন্যবাসী।

শরৎ আসছে

সন্দীপ দাস (বি.এ- দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-১১০)

বর্ষার ঘন কালো মেঘ সরিয়ে
শরৎ আসছে,
বর্ষা ঘন আকাশ যেন,
গন্ধ মাখা রৌদ্রে
প্রাণখুলে হাসছে
শরৎ আসছে।
ঘাসের উপর শিশির বিন্দু
মাঠে মাঠে কাশ ফুলের বাহার
সূর্যের সোনালি আলোয় হীরকদ্যুতি।
শিউলি তার সুবাস দিয়ে
ঝরে পড়েছে।
আকাশে আকাশে থোকা থোকা মেঘ হাসছে
শরৎ আসছে।
খালে ও বিলে ফুটেছে পদ্ম
শালুক ও নীল উঠেছে সদ্য
পুষ্পের আহ্বানে ভ্রমর কুল
গান গেয়ে ছুটে চলেছে
শরৎ আসছে।
পুজোর গন্ধমাখা মনোরম
স্নিগ্ধ বাতাসে ভর করে
প্রবাসীরা ঘরে ফিরছেন।
বাংলার ঘরে মা আসছে।
শরৎ আসছে।

ভুল

রিতা নস্কর (বি.এ-সাধারণ- দ্বিতীয় বর্ষ)

ভুল মানুষের স্বভাব
ভুল মানুষের যন্ত্রনা,
তাই বলে কি ভুলের বসে
করবো নাকো সাধনা ?
বই পড়তে, কাজ করতে
হয়েই যায় কত ভুল,
তাই বলে কি কেঁদে কেটে
উড়াবো মাথার চুল ?
বৈজ্ঞানিকরা তো ভুল করে
আমরা করলে দোষ কী ?
অঙ্কে এবার শূন্য পেলাম
তাই বলে কি পড়বো না ?
সংগ্রাম করে লড়তে হবে
পড়া ও তবু ছাড়বো না।

কবিতা

তুমি নেই

সুভাষ কর্মকার
(বি.এ-সাধারণ- দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-৭৭০)

জানি আর তোমার সাথে
হবে না আমার দেখা।
তোমার সামনে দিয়ে
চলে গেছি বিদায় নিয়ে
সহসা হলাম যে একা ॥
তুমি নেই মোর কাছে
তাছাড়া সব একই আছে।
কাটে বেশিদিন তোমার স্মৃতির মাঝে
কি করে আছো তুমি আমায় ভুলে।
এত স্বাদ মমতা মাখা
ছিল তোমার আমার কত কথা
কেমন করে বলবো তোমায় আজ
ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি যে আজ ॥

একাকিত্ব

লিজা খাতুন (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৬০)

একদিন চলে যাব।
যেতে হবে একা।
তবুও সান্ত্বনা পেলে কিছু তারা গোনা।
পাবো মৃত্যুর দেখা
নীল আকাশে যাব আমি মিশে
জানিত কঠিন সত্য
এসেছি একা, যেতে হবে একা।

স্মৃতি

রাকিবুল সরদার (বি.এ- প্রথম বর্ষ)

দু-প্রহর রৌদ্র মধ্যে
গ্রীষ্ম দিনে একান্তে,
তোমায় কিছু দেবার তরে-
দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে;
হরিণীর মতো এসেছিলে ছুটে
রিমঝিম শ্রাবনে গেয়েছিলে গান,
দেখেছিলাম তোমায় একদৃষ্টিতে-
নেচেছিলে ময়ূরীর মতো তুলে পেখম;
তোমায় পড়ে মনে.....!
ঝিকিমিকি তারার শরৎ সন্ধ্যায়
চাঁদনীর লাবন্যময় জোৎসনায়,
তোমারই প্রেমের নিবড়তায়..
হয়েছিলাম দারুন মুগ্ধ।
সোনালী ধানের মতো হয়েছিলে সেদিন
কত যে অলঙ্কার পরেছিলে দেহেতে,
তোমারই অপূর্ব সাজে-
হেমন্তটা নতুন হয়েছিল পার নিকটে;
স্নিগ্ধময় শীতের শুভ্র প্রভাতে
প্রজাপতি যেমন ধেয়েছিল মধুর সন্ধানে,
মরাল যেমন চলেছিল মরালীর পাচে-
তেমনই ঘুরেছিলাম তোমারই সাথে;
তোমায় পড়ে মেন.....!
বসন্তে সেদিন একই সঙ্গে
ছিলাম বসে নদীর কিনারে,
দেখেছিলাম পাখি উড়িতে গগনে-
দেখেছি মাঝির তরী টানিতে;
হয়ে এল সাঁঝ তারপর,
তুমি গেলে ওপার
পরলে তুমি মনিহার
প্রকৃতি হয়ে গেল আঁধার;
তোমায় পড়ে মনে....!

আজও আছি তোমার আশায়

আসান আলি (বি.এ-সাধারণ- দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-১২)

তুমি ছাড়া কেউ নেই এ জীবনে আমার
তোমাকে পেলে আমি-আমি হবোযে তোমার
আমার সেই পুরানো স্মৃতি মনে করে দেয় তোমার কথা
তুমিতা বোঝনা কেন আমার সেই ব্যাকুলতা ॥
সবার মতো ফুটে আছো ওই বাগিচার মাঝে
তোমাকে পেলে রাখবো আমি আমার বুকে মাঝে।
বুকের মাঝে আমি যদি তোমাকে না পাই
এই হৃদয়কে নিয়ে আমি তখন কোথায় যাই ॥
আলো যদি নাই বা বাসো-ঘৃনার চোখে দেখো,
সাথী হারা প্রেমিককে একটু মনে রেখো ॥
শুধু জানি তুমি ছাড়া কেউ নেই যে আমার
তোমার জন্য আমি ও প্রিয়া তুমিযে আমার ॥
তোমার হৃদয় আজ আমাকে করেছে পাগল
তুমিই আমার জীবন আমারই মরণ,
মনে মনে চেয়েছি তোমার হৃদয়টাকে
তুমি কেন বোঝনা আমার এই জীবনটাকে ॥
সদূরে তাকিয়ে আছি তোমার আমায়
তুমি কেন আসোনা আমার বাঁসায়
কোমল হাতের একটু ছোয়া যদি পাই,
আমার বুকের মাঝে সেটা গেঁথে নিতে চাই ॥
আমার মনযে শুধু তোমাকেই চায়
তাইতো আজও আছি তোমার আশায় ॥

স্মৃতি

লিজা খাতুন
(বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৬০)

স্মৃতিকে স্বরণ কোরনা দুঃখ পাবে
দুঃখকে প্রশয় দিওনা কষ্ট বাড়বে।
জীবনেরে সাধ যদি কষ্টই হয়
তবে মরণ কাকে বলবে ?
জীবনকে ভালবাসো
ব্যর্থতা কেটে যাবে।
ভালবাসাকে বিশ্বাস কর
ভুল ভেঙে যাবে
গোলাপকে ভালোবাসো
কাঁটার আঘাত সয়ে যাবে।
সুন্দরকে ভালোবাসো
পবিত্রতা বুঝতে পাবে।
পথকে বন্ধু ভাবো
গন্তব্যে পৌছে যাবে
কিন্তু স্মৃতি ?
স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিওনা
দুঃখ পাবে কষ্ট বাড়বে ॥

মাদার টেরেসা

মনিরুল ইসলাম গাজি
(বি.এ-প্রথম বর্ষ,[ইংরাজি] রোল-১০০০)

গঙ্গার মত হৃদয় তোমার
যমুনার মত দিল
তোমার মত কাউকে আমরা
করতে পারিনা মিল।
বাবা-মা হারা হাজার শিশু
পড়ে ছিল ফুটপাথে
কেউ নেয়নি তাদের দায়িত্ব
নিয়েছ তুমি নিজ হাতে।
অনাথ শিশুদের জন্য তুমি
জীবনটা করলে দান
কাকে আমরা মহান বলব
তুমি-ই মহৎ প্রান।
আমরা মানুষ তুমিও মানুষ
তবে ভিন্ন হৃদয় কেন ?
আশীর্ব্বাদ কর আমাদের জন্য
তোমার মত হই যেন।
তোমার হৃদয় বরফে গড়
আমাদের গড়া লোহায়
ঈশ্বর আমাদের গলিয়ে দেবেন
সেটাই আমাদের সহায়।
এতিম শিশুদের মাতা ছিলে
ছিলে তাদের ভরসা
স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে
বিশ্বজননী 'মাদার টেরেসা'।

জীবন

রিতা কর্মকার
(বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৩০)

ভালোবাসার মধুর সময়
যাকে উপরভোগ করতে হয়।
একটা বিশ্বাসের জায়গা
যাকে হারানো উচিত নয় ॥
একটা তাসের ঘর
হাত লাগলে ভেঙে যায় ॥
জীবন্ত প্রানের উৎস
সবারই স্থান এখানে
ছোট্ট একটা পাখির বাসা
পড়লেই ভেঙ্গে যায়॥
একটি জলন্ত প্রদীপ
হাওয়া লাগলে নিভে যায়
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো
পড়ে গিয়ে মিশে যায়
একটি গোলাপের পাপড়ি
হাত দিলেই ঝরে যায় ॥
একটা বড় সংগ্রাম
যাকে জয় করতে হয়॥
এই জীবনে যে কষ্ট করবে
তারই জয়,
আর যে পরাজিত হবে
সে বিদায় নেবে...
এরই নাম জীবন

বিদায়

আরাবুল মোল্যা
(বি.এ-প্রথম বর্ষ, এডুকেশন, রোল-৬৯৬)

বন্ধু তোমার বিদায় বেলায়
ভিড় জমেছে অশ্রু মেলায়
থাকিও তুমি আনন্দে সেথায়
যেওনা ভেঙে স্মৃতির ব্যথায়।
তুমি চলেছো বহুদূরে-
গ্রাম ছেড়ে মুম্বাই শহরে,
শুধুই উপার্জনের তরে,
জোগাতে মুখের অন্ন।
বন্ধু তুমি আবার আসিবে
তখন কি আর দেখা হবে ?
জানিনা আমি রব কিনা রব
তোমার সঙ্গ কি আবার পাব
বন্ধুত্ব কি রইবে পবিত্র এমন
আগে ঠিক ছিলাম যেমন।
বন্ধু, তুমি চলেছো অনেকদূরে
মোরা আজ আনন্দে রব কেমন করে ?
তোমাকে কাছে না দেখে,
যাবে তুমি স্মৃতিটুকু রেখে
বন্ধু, মনের বাঁধ ভেঙেছে আজ
মনে প্রানে নাহি কোন লাজ,
অশ্রুঝরে অঝরে দু-নয়নে
গম্ভীর হয়েছে প্রতিবেশী জনে।
শোকের ছায় নেমেছে বাড়িতে,
তবুও হবে তোমাকে যেতে,

পিছনে-পিছনে সকলে আসিল
পিতা-মাতা তোমার অঝরে কাঁদিল।
তবু গাড়িতে তুমি রাখিলে চরণ
বিদেশ তোমাকে করিল বরণ।
তোমার দেওয়া হাত-ছানিটা
হৃদয়ে বিধেছে হয়ে কাঁটা
ব্যথিত আজ হইল হৃদয়
দিতে তবুও হল তোমাকে বিদায়।
ঝড় উঠেছে মনে মরুঝড়
কাঁপিছে বুক থর্ থর্
নয়নে এবার আসিল বৃষ্টি
আবছা তাই হতেছে দৃষ্টি।
তুমি নয়নের অন্তরালে
বহুদূর আজ গিয়েছো চলে।
সান্ত্বনা দিতে পারি না মনে
অশ্রু শুধু আসে নয়নে
আঘাতে হৃদয় ভগ্ন হইল
মরুঝড় তবু নাহি থামিল।
ভালো থেকো বন্ধু তুমি
প্রার্থনা করি আমি
বাড়ির সকলেও প্রতিবেশী,
করি স্মরণ তোমায় দিবা নিশি
তুমি ভালো থেকো সুখে থেকো
আমাদের মনে রেখো।

স্কুল কলেজের পসরা

শোভন দাস (বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ,[রাষ্ট্রবিজ্ঞান])

প্রাথমিক ইস্কুল ছিল-
সেখানে ছিল না আমাদের কোন স্বাধীনতা,
পরতে হতনা কোন স্কুল ইউনি ফরম,
ছিল শুধু সাধারণ শাসনের বেড়া জাল।
তারপরে এল এক নতুন উচ্চ হাই স্কুল-
সেখানে ছিল বড় বেয়াড়া শাসন।
স্কুল ইউনি ফরম পরেনা এলে
যাওয়া যাবে না কোনদিন স্কুলে।
পড়া না হলে সেখানে হবে শুধু
কান ধরে উঠবোস।
টিফিনেতে পালিয়ে বাড়ি যাওয়া
পরের দিন বুঝবে মজা-
শুধু কান ধরে উঠবোস।
না পড়লে পড়া, তাই কান্ ধরে উটবোস হবে সাজা।
বলব কি স্যার ম্যাডামদের
আক্কেল হলনা আমাদের।
তার পরে এল এক মহাজীবনের কলেজ
এখানে ছিলনা কোন শাসন
ছিল শুধু স্বাধীনতার অগ্রাধিকার।
পড়াশোনা হত বেশি
তার চেয়ে বেশি হত আড্ডা।
কলেজ মানেইতো শুধু আড্ডা।
ম্যাডাম স্যারেরা ছিলেন ভাল-
পড়াশোনা তাই হতভাল
বলেছিলাম আমরা।
তারপর একদিন কলেজেতে ঢুকে গেল
রাজনীতির পাহাড়।
শুরু হল রাজনীতি মারপিট আর দাঙ্গা
এই নিয়ে আমাদের স্কুল কলেজের পসরা।

সাধ হয় শহরে যাই

রেজাউল হক (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৪৮)

আমি এক গায়েরেই ছোড়া,
সবাই চেনে অনেক নামে।
আমায় বড়ই সাধ হয়েছে,
গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাই।
মা-বাবা ভারি বকে,
বললাম আমায় উপায়।
সাধ হয় এবার,
গ্রাম ছেড়ে শহরে যাই।
শহরে নাকি অনেক ধন,
ছিনিয়ে নেব এবার।
শহরে যবেই ঢুকলাম,
তবেই দেখতে পেলাম এবার।
ধন নিয়েই লড়াই চলছে তখন,
শহর হয় সারখার।
দিন কয়েকদিন কাটল এবার,
জলের উপর ভরসা করেই।
এবার বুঝি ফিরতে হবে,
আপন গাঁয়েতেই।

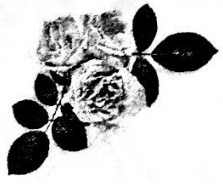

আকাশ কুসুম

সাহানোওয়াজ আলম (বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-৩৫৯)

চারিদিকে শুধু নিষেধের তর্জনী
আমি ছুঁয়ে থাকি ধূলোমাটি প্রান্তিকে
চোখে নেমে ছিল বিসর্জনের ছায়া
ডেকে ছিলে তুমি তখন জানান্তিকে।
কারা চেয়েছিল স্বপ্নের মায়া বুনে
পিঠে জুড়ে দিতে দুটি উজ্জল-ডানা।
আকাশ বিলাসে হইনি স্বেচ্ছাচারী।
মায়াবী ঝাঁপিঠে খুলতে করেছো মানা।
পথ ডেকেছিল প্রখর গ্রীষ্ম রোদে
দূর দুর্গম ছায়াহীন প্রানতরে।
আকাশে ছিল না সজল মেঘের ছায়া।
তুমি শুধু ছিলে তৃষিত এ অন্তরে।
ছিল অবিরাম ক্লান্তিবিহীন চলা
রুদ্ধ দিনের দেউড়িটা হতে পার।
আমি যত চলি সামনে পেছনে শুধু।
সংক্ষোভে কাঁপে অশান্ত সংসার।
যেতে যেতে দেখি তোমারই করতলে।
আকাশ কুসুম ভিজছে চোখের জলে।

যাত্রীবাহী ডি:এন-১৬

রাজেস বোস (বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-৩৭৯)

আমি যাত্রি বাহী
আমি লোকের উপকারে লাগি।
আমার বুকে কত শত শত
ব্যাথা আছে রত।
কেউ বা মারে লাথি
কেউবা করে গালি।
এভাবেই পেরিয়ে যায়
আমার চিরকাল।
আমি উপকারি
আমি মানুষকে বহন করে নিয়ে আসি
কেউ বা দেয় পয়সা
আবার কেউবা দেয়না
তাতে আমার নেই কোন বায়না।
বড় চির আকাঙ্খি আমি
কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর কাছে,
ষ্টশনে আমার আগমনে
তাদের মন বড় প্রফুল্ল হয়ে তটে।
তাড়াতাড়ি, লাফালাফি
আর হই হুল্লা।
এভাবেই পথ চলার
উৎসাহ দেয় আমার বন্ধুরা।
এভাবেই উপকার
করে যাবো আমরা নব জাতকের কাছে
এ আমাদের শত শত কামনা।

কৃষি

রেজাউল হক (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৪৮)

কৃষির উপর ভরসা কররেই,
চলতে হয় এজীবন।
কৃষি আমাদের জীবন-বাঁচন,
কৃষি আমাদের ভরন-পোষন
কৃষি ছাড়া চলতে পারে না,
আমাদের জীবন।
যারাই করতো কৃষির বড়াই,
তারাই আনছে কৃষির সর্বনাশ।
কৃষির সার্থে এনেছে যারা,
কৃষক সমিতি।
তারাই কিনা করছে এবার,
কৃষির ধ্বংস বাস।
যারাই নাকি বলছিল,
কৃষক কেন অসহায়।
তারাই এবার বলছে এখন,
কৃষক এখন হয়েছে ধনবান।
যারাই নাকি বলছিল,
কৃষকের সংগ্রাম।
তারাই এবার বলছে এখন,
পুজিবাদী-শিল্প প্রতির সংগ্রাম।
বলছে যারাই শিল্প প্রতি,
তারাই নাকি অসহায়।
আসলে তো সেটাই নহে,
কৃষক দরদির ধনে অভাব হয়।
বিদেশিদের লগ্নি করে।
আনছে যত পুজিপ্রতি।
কৃষকেরই ভূমি দেখিয়ে,
বলছে কৃষক দরদি
এটাই তোমায় হতে পারে,
যদি দিতে পারো অনেক টাকা।
তিন ফসলাদি জমি দেখিয়ে,
বলছে কেন্দ্র সরকারের কাছে।
ফসল বিহিন জমি এটা,
দিলাম বিদেশির হাতে তুলে।
কৃষকরাই করছে যখন বাঁধা
প্রশাযন দিয়ে তখন রুখছে তাদের
বলছে তখন কৃষক দরদি ভাই,
শিল্প কি হয় আসমানেতেই।

এ যুগের নেতা

ইকলামা পতি মন্ডল (বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-৪৮৫)

সারা ভোটে জিতে হচেছ দেশের নেতা,
জনগনকে ভূলিয়ে ভালিয়ে বলে মিথ্যা কথা,
তারা ঝুড়ি ঝুড়ি প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের করে শ্রোতা।
তারা হল দেশের নেতা।
তারাই নেবে দেশের ভার,
সারা গরিবের রক্ত শোষন করে পকেট করে ভার।
যারা দেশকে বিদেশের কাছে বিকিয়ে দিয়ে টাকা কারে ধার
তারাই হল মন্ত্রী মিনিস্টার তার হল স্যার।
যারা চায় দেশের উন্নতি, যারা ছাড়া নেই দেশের গতি,
যারা গরিবের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে করছে ভীষন ক্ষতি।
তারাই হল দেশের নেতা তারাই হল কোটিপতি।
নেতারা খায় মাংস পোলাও, গরিবেরা খায় রুটি।
সেই গরিবই তাদের জুতোর তলায় পড়ে করছে লুটপুটি
গরিবের রক্তে বানায় যারা স্ত্রীর গলার হার
তারাই হল এযুগের নেতা তারাই হল স্যার।

নতুন পুরানো

এস.জে. হোসেন

(বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-১০৩)

ঘটনা পুরানো হলে
হয় ইতিহাস,
মানুষ পুরানো হলে করে উপহাস।
পোষাক পুরানো হলে
ফেলে দিই তারে,
জীবন পুরানো হলে
যায় চিরতরে।
গাছপালা ঘরবাড়ী হলে পুরানো,
ভেঙেচুরে কেটে ফেলে
হয় বানানো,
বুদ্ধি পুরানো হলে
কাজ হয় ভালো।
বধূ পুরানো হলে
কমে যত্ন।
বন্ধু পুরানো হলে
জন্মেনাকি অতি,
দিনপুরানো হলে
বয়ে যায় স্মৃতি।

বেদনা

এস.জে. হোসেন

(বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-১০৩)

জীবনের এই চলার পথে,
কত দুঃখ হয়ে থাকে।
জীবনের এই লোর পথে,
কতদুঃখ হীয় থাকে।
ভুলতে না পারি সেই দুঃখের কথা
গেঁথে রাখি অন্তরে কত মনের ব্যথা।
বেদনার আখি ভেসে যায় জলে
অন্তরে তবু জাগে কিছু করব বলে।
মুখে তবু হাসি নিয়ে সর্বদা থাকি
সবার সাথে, মিলে মিশে সবার মনরাখি।
দুঃখ ভরামন নিয়ে
আত্মাভিমানে মরি,
ব্যথা ভরা জীবন স্মৃতি
ভুলতে না পারি।

উপহার

মাফুজা গাজী (বি.এস.সি-প্রথম বর্ষ, রোল-৩১)

উঃ-উপাদেয় হোক তোমাদের/আমাদের মনে বড় হওয়ার ধ্যান।
পঃ-পরের ত্বরে জীবন তোমাদের নাইবা হোক বলীদান।
হাঃ-হাজার প্রদীপ জ্বলে উঠুক তোমাদের চলার পথে।
রঃ-রক্তে কোমলে ফুটে উঠুক তোমাদের চলার পথে।

মরিচিকা

মোঃ আলিনূর রহমান

(বি.এ-প্রথম বর্ষ, এডুকেশন, রোল-৭৬৬)

মরিচিকা ওগো মরিচিকা
আমি তোমায় ভালোবাসি।
তোমায় পাওয়া যাবে জেনেও
ছুটে তোমার কাছে আসি-
আমি তোমায় ভালোবাসি।
তুমি স্বপ্নের স্মৃতি সুধা-
জানি মিথ্যা প্রহেলিকা-
স্বপ্নই রয়ে যাবে চিরকাল
বাজিয়ে প্রাণের বাশি।
তবুও তোমায় ভালোবাসি।
তোমার নীরব হাত ছানি
শুধু দৃষ্টি ভ্রম জানি।
যখনই কাছে আসি পালিয়ে যাও
দেখিয়ে নিষ্ঠুর হাসি।
তাইতো তোমায় ভালোবাসি।
তুমি আমার মরিচিকা-
জানি রুগ্ন বালিকা-
আমারই মত সে যে শত পথিকের
চোখের জলের রাশি-
তবুও তোমায় ভালোবাসি,
শুধু তোমায় ভালোবাসি।
তাইতো তোমায়-ভালোবাসি।

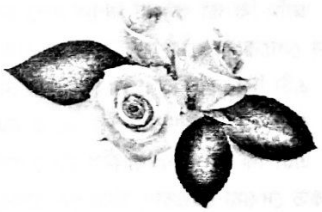

বিদায় বেলা

আসুমা খাতুন (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-২৬৯)

জানি তুমি এক দিন চলে যাবে,
আমার হৃদয় শূন্য করে।
আমি পারিবো কি থাকিতে একা?
উদাস হয়ে তাই যে আমি বসে আছি একা।
যে মালা রেখেছি গেঁথে হবে বা কি সেটা
সাধযে ছিল বাসবো ভালো, বাঁধবো ছোট বাসা।
এই আশাতে এই বাসাতে নেই সে কোন বাধা
এই প্রেম এই প্রীতি এই যে ভালোবাসা
এই নিয়ে বাজাবো মোরা ছিল যে বড় আশা।
অনেক স্মৃতি বুকে নিয়ে বেসেছি তোময় ভালো
পাবো কি-তোমায় আমি এই কথাটি বলো
যদি না পাই তোমার দেখা-
তবে কি হবে এই বিদায় বেলা।

উনিশ কুড়ি

নুরুজ্জামান মোল্য
(বি.এ-তৃতীয় বর্ষ, রোল-৬৬)

উনিশ কুড়ি বয়স আমার,
এটা কি কোন ভাবনা।
একটু আধটু হবে যে প্রেম,
এটা কোন ক্ষতি না।
বসবে পাশে বলবে কথা,
আমি কি তা শুনবো না।
দেখবে লোকে বাঁকা চোখে,
এটা কি কোন কথা না।
মনের কথা মন যে শোনে,
এটা কি কোন ঘটনা।
হবে কত দেওয়া নেওয়া ,
ভাবতে কত লোকে না।
বলবে লোকে শতকথা,
হবে কত ধারণা।
ফাটুক লোকে চটুক লোকে,
উনিশ কুড়ির বাধা না

শুধু তোমাকে চাই

উর্মিলা (বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-১৯০)

তুমি আমার জীবনের একটি সূর্য,
যার আগুনে আমি শেষ হতে চাই ॥
আমি আমার আকাশে একটি চাঁদ
যে শুধু আমাকেই আলোকিত করে।
তুমি লক্ষ তারার মাঝে একটি ধ্রুবতারা
যে শুধু আমাকেই ঈশারা করে।
তুমি গোয়ার সমুদ্র
যে শুধু আমাকেই ডাকে।
তুমি সমুদ্রের মতই গভীর।
যার অতল জলে আমি ভেসে যেতে চাই।
তুমি দীঘার সমুদ্রের একটি মাত্র ঝিনুক
যার মধ্যে আমি মুক্ত হতে চাই।
তুমি সমস্ত দার্জিলিং এর একটি তুষার খন্ড
যার স্পর্শে আমি শীতল হতে চাই।
তুমি হাজার ফুলের মাঝে একটি গোলাপ
যার সৌন্দর্য শুধু আমি অনুভব করি।
তুমি অনেক পাখীর মধ্যে একটি ময়না।
যার সুন্দর কথা শুধু আমাকে শোনায়।
তুমি অনেক পাখীর মধ্যে একটি কোকিল
যার বসন্তের গান শুধু আমি শুনি।
তুমি অনেক ময়ুরীর মাঝে একটি ময়ুর।
যার ছন্দ বাহারে আমি প্রান খুঁজে পাই।
তুমি অনেক অসম্পূর্ণ ফুলের মাঝে একটি সম্পূর্ণ ফল,
যার মাঝে আমি জীবনের স্বার্থকথা খূঁজে পাই।
আর তো আমি শুধু তোমাকে চাই।

রঙিন স্বপ্ন

পার্থ সাধুঁখা
(বি.এ-বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-৭১৯)

নতুন জীবন বাড়ন্ত যৌবন,
ভাললাগার নতুন জীবন।
প্রথম দেখার ভালবাসা।
চলার পথে নতুন আশা।
তোমার আমার ভালবাসা।
রঙিন স্বপ্নে মোড়া।
যৌবনে প্রথম দেখাতে,
ভালবাসি আমি তোমাকে।
নতুন চাওয়া তোমার পাওয়া,
কলেজ পালিয়ে পার্কে ঘোরা।
বাসা হওয়া স্বপ্ন দেখা
জীবনের বহি:শিখার।
দেখে শুনে প্রেমে পড়া।
বসন্তের রঙের খেলা।
যৌবনের এই রঙিন স্বপ্ন।
ভোলা কি করে রাখব।

স্মৃতি পট

দেবাশীস মন্ডল (বি.এ-সান্মানিক, তৃতীয় বর্ষ)

বসে আছি একা আনমনে
জানিনা তা ঠিক কোনখানে।
সহসা খুলে গেল স্মৃতির দুয়ার
ফিরে যাই অতীত জীবনে আবার।
আজও রয়েছে মিশে ধূলিকনা পরে
সেই গেল চলে আসিলোনা ফিরে।
জীবনের শেষ আশা দ্বীপের শিখায়
ভাঙে আর গড়ে শুধু প্রকৃতি নীলায়।
মনে হয় সাধ যেন মিশে হায় হায়
অসীমের মাঝে বুঝি ডাকে ঈশারায়।
ধ্রুবতারা চেয়ে রয় আকুল নয়নে
খুঁজে ফেরে শুধু তাই গগনে পবনে।

নিরাশা

শোভা রঞ্জন সরদার (বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-৫১৪)

শরৎ প্রাতে দেখে ছিলাম,
তোমার ওই রাঙা মুখ।
তোমার ওই টোল ফেলা হাসিতে
ভরে উঠে ছিল আমার হৃদয়।
মন বলে উঠে ছিল একটি কথা
বলতে পারিনি সে কথা তোমায়।
ভেবেছিলাম তুমি আমার
বাগানে ফোটা ফুল,
অন্য মালি এসে তোমায়,
নেবেনা ছিঁড়ে।
সময়ের সিঁড়ি বেয়ে একদিন
গেলাম তোমার কাছে।
নিলে না আমার করে
করে দিলে পর।
ভুল হয়ে ছিল আমার
ক্ষুদ্র মাছি হয়ে
প্রজাপতির সাথে পালা করে
আকাশে উড়তে যাওয়া।

আজও ভুলতে পারিনি

মোঃ সামিম আক্তার (বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-২৭)

আজও ভুলতে পারিনি
তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা
সেই কলেজ গেটের সামনে
রূপশ্রী, মনে পড়ে সেদিনের কথা
সেদিন কত ঘন্টার পর ঘন্টা
পার করেছি হাতে হাত চোখে চোখ রেখে।
কত দিবা স্বস্পই না দেখেছিলাম
তোমার ঐ মুখ দেখে।
কতইনা কল্পনার সাগরে ভেসেছি
তোমাকে নিয়ে ড্রিম হাউস গড়ার।
সেদিন তুমি আমার হাত ধরে বলেছিলে
অনন্তকাল রব আমরা এক যুগল মানব।
তারপর বেকারত্বের জ্বালায় ছুটেছি
সুন্দর বনের কোন এককোণে
তখন থেকেই হারিয়ে গেছে তোমার টাওয়ার
আমার মোবাইলের কোন থেকে।
বার বার ম্যাসেজ পাঠিয়েছি
তোমাকে দেখার জন্য।
ভেবেছিলাম তোমার আগমনে লাল হবে
আকাশের পূর্ব কোন।
তোমাকে দেখতে না পেয়ে হৃদয়কে বলেছিলাম
রূপশ্রী প্রস্ফুটিত হবে নিশ্চয় কোন বসন্তের আকাশে
কিন্তু দীর্ঘ আট বছর পর যা দেখলাম
তা লাল হল না পূর্ব কোন লাল হল তোমার শিথি।
ভুলেছে সেদিনের আকাশ বাতাস রবীশশী আর মেঘমালা
একা বিংশ শতকে দাঁড়িয়ে আজও।
ভুলতে পারিনি আমি কেবল আশি।

তীরবিদ্ধ পাখী

আবীর আলি মোল্যা (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৩৯৯)

জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি নই
তবু ও তুমি জড়িয়ে
ছিলে আমাকে।
দেখিয়ে ছিলে কত স্বপ্ন মরিচিকা--
জাগিয়ে ছিলে কতস্বপ্নের কথা।
আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা
উজাড় কারে ছিলাম তোমার ত্বরে
তুমি অপমান করলে আমার
ভালোবাসাকে।
নিজের ফেলে আসা অতীত ভুলে
বিশ্বাস করেছিলাম তোমাকে
তার বিনিময়ে করলে চরম আঘাত।
শেষ করে দিলে আমার জীবনকে
তোমার ছলনা ময়ী অভিনয় দিয়ে।
কাঁচকে ভেবেছিলাম হীরে
সেই কাঁচের আঘাতে
আমার হৃদয়কে করলে রক্তাত্ব
জানিনা আমি তোমার কাছে
করেছিলাম অপরাধ।
যার মাসুল দিতে গিয়ে
আকাশের বুকে আজ আমি
এক তীর বিদ্ধ পাখী।
যার হৃদয়টি এখন তীরের আঘাতে
ভেঙে হয়ে গেছে চৌচির।
সে পাখিতো আর পারবে না
শোনাতে প্রেমের সেই গান।
সে তো শুধু অঝর নয়নে অশ্রু ঝরায়
ব্যাথায় ভরা বুক নিয়ে---
জানি তোমার প্রেমে--------।

ছাত্র জীবন

মোহিত লাল মন্ডল (বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-২১৯)

ছাত্র জীবন ছাত্র জীবন
কলেজ জীবন ভাই।
স্কুল জীবন পার করেই
কলেজ জীবন পাই।
ভাঙ্গড় কলেজ লাগে সবার ভালো
তাইতো সকল ছাত্র-ছাত্রী জ্বালাতে আসে জ্ঞানের আলো।
কলেজে আছে পিতৃ তুল্য স্যার
আর আছে মাতৃ তুল্য ম্যাম।
কলজে জীবনে আছে বাঁধন ছাড়া হাঁসি খুশি
আর আছে দাদা দিদিদের ভালোবাসা।
কলেজ মানে পড়া শুধু তাই নয়
আছে অনেক আচার অনুষ্ঠান মনে রেখ ভাই।

ভাঙা

মনোজ কুমার দাস (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৬৫৬)

যা কিছু ভাঙার প্রয়োজন অনায়াসে ভাঙতে পারি সব
ভোরের শয্যায় স্বপ্ন ভাঙে।
মন ভাঙে বেকারত্বের যন্ত্রনায়,
ইদানিং মন্দির মসজিদ বিতর্কে দেশ ভাঙার পরিকল্পনা।
সেটাও, সম্ভম হবে কোন একদিন বিশেষ মুহূর্তে
কলকাতার লাল বাড়িটা যার মেরু---
হিমালয় পাহাড়ের মত শক্ত।
তাকে ভাঙার ছকও।
আমার নি:ছিদ্র হাতের মুঠোয়
মনুমেন্ট, ওর জন্য সামান্য একটা টুসকিই যথেষ্ট,
আমিই তো উনিশশো সাতচল্লিশ সালে কারাগার ভেঙেছি,
ঘরের বউটাকে বিক্রী করলাম
কলকাতার নীল আলোয়।
এখন সে রাত্রি ভেঙে সুখ কুড়োয় নরম ঠোঁটে খুটে খুটে
আরও অনেক কিছু ভাঙতে জানি যখন তখন।
শুধু পারিনা জ্বলন্ত চিতা ভেঙে,
আধপোড়া শব তুলে আনতে।
যে হাসতে হাসতে বলবে,
দ্যাখো, বাঁচার অধিকারকে মৃত্যুও ভাঙতে পারেনি।

আজকের প্রশাসন

মোঃ ইয়াউর রহমান আনছারী (বি.এস.সি-প্রথম বর্ষ, রোল-১১০)

সরকারের সৃষ্টির অন্যতম সংস্থা--প্রশাসন',
এক শ্রেণীর মানুষ গ্রহন করছে এরই আসন।
প্রশাসন জনতাকে সঠিক শাসন দেয়,
সন্ত্রাসীরা জনতার দুর্নীতির শাসনের ভার নেয়।
তাই সন্ত্রাসীরা দমনিত হয় প্রশাসন দ্বারা,
সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অফুরন্ত ভয়ঙ্কর,
প্রশাসন তৈরী করে নির্ভয় অহংকার।
-----এটাই প্রশানের নিগুড় কর্তব্য।

কিন্তু, আজকের সরকারের সৃষ্টির অন্যতম কলঙ্ক প্রশাসন,
সাধারণ মানুষের ভয়ের অন্যতম আসন।
প্রশাসন কথার অর্থ সঠিক শাসন ব্যবস্থা,
আজকের প্রশাসন হল অন্যায়ের সু-অবস্থা।
সন্ত্রাস-প্রশাসন আজ একই পথের অগ্রদূত,
প্রশাসনই, সন্ত্রাসের সৃষ্টির দূত।
দেশের জনগনের পরিস্থিতি আজ সংকটজনক অবস্থা
যদি পরিবর্তন না হয় প্রশাসনের কু-ব্যবস্থা।
হে প্রশাসন তোমরাই জনগনের রক্ষা কবজ-
তোমরাই জনগনের দুর্নীতি শাসন ব্যবস্থার মধ্যে করিতেছ বিরাজ।
পরিবর্তন কর এই শাসন ব্যবস্থা
পরিবর্তন হোক আজকের সরকারি অবস্থা।
তবেই মানুষ হবে শান্তিময়--------
তবেই মানুষ হবে শান্তিময়-----
তবেই পৃথিবীর শান্তি আমাদের করবে সুখময়।

ব্যাথা

অভিজিৎ মন্ডল
(বি.এ [অনার্স]-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-৭০৪)

জীবনে বেশি কিছু পেতে চাইনা
কুণ্ঠাবোধ করিনি কোন কিছু দিতে ॥
ব্যাথা শুধু পেয়েছি এ-হৃদয়ে বারে বারে
না পাওয়ার যন্ত্রনায় জীবনটা ভরে গেছে হাহাকারে ॥
প্রেম এলো আলেয়া হয়ে,
সুখ... সে তো চোখের জল,
জীবনটা আজ পদ্ম পাতায়
করে টলমল ॥

স্বাধীনতা

সেখ সহিদ হোসাইন (বি.এস সি-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-৬)

সেদিন, হঠাৎ চমকে দেখি ফুটপাতে,
বৃদ্ধাএক করছে মাতন রক্তমাখা হাতে-
আঃ আ-আ-আ-র মারিস না বাবা।
তব, সবাকার হিয়া পড়িয়া বাঁধা কলির ভবের সাধনায়-
বসায়েছে করল থাবা।
টাকা নয়, বিলাস নয়, বৈভব নয়,
দুটি আন্নের লাগি করিছে প্রার্থনা,-
কত আঁধার কালো ঝুপড়ি দরাজ দিলে আলিঙ্গিছে যমরাজে
করিছো কি গননা ?
কচি কচি প্রান কলের করাল ধূমে করিছো ফেরি
নিখিল পবন আনিছে বহি বরুদের গন্ধ শান্তি হেরী,
কর্ম আবাহান নারী নিশীথে,-
কলঙ্কিনী গতিহীন একাকি।
পনের সংযমনে হয় সে সহধর্মিনী
জানো কি ?
লজ্জিতে হয় আজো নিবন্ধনহীন শত যন্ত্রনা,-
ওহে নারী মর্ত্যভূমে অবতরনে নাহি তব অধিকার
ওই শোন, কারা যেন সংগোপনে করিছে মন্ত্রনা।
শুভ্র সবিতার প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এতো হীনতা ?
ওরে শৃঙ্খল মুক্ত বিহঙ্গ পিঞ্জর বদ্ধ মুক্ত পরাধীনতা
এটাই কি স্বাধীনতা ?...

স্মৃতি চিহ্ন

দেবাশিস দাস
(বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-৩২৬)

কোন একদিন হারিয়ে যাব
সবুজ ফুরিয়ে যাবে,
দ্বীপ নিভে যাবে
তবুও আমি থাকবো
এই প্রতিশ্রুতি নিয়েই
নিচ্ছি বিদায়,
এই শতাব্দী থেকে।
যাবো আশা নিয়ে,
তোমরা নিও আমার শ্রদ্ধা,
আর প্রনতি ভরা নমস্কার।
আমি এই শতাব্দীরই
স্মৃতিচিহ্ন।

কলি যুগের মেয়ে

হাবিবুর রহমান দফাদার (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৭১৯)

কলি যুগের মেয়েরা ভাই কলি যুগের মেয়ে
গগসল পরে নাকের ডগায় উপরে থাকে চেয়ে।
কানে বড় দুল পরে আর হাতে বাঁধে ঘড়ি
প্যান্ট শার্ট পরে তারা পরে না আর শাড়ি।
বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে পরে যে প্যান্ট শার্ট
হিন্দি গান আর সিনেমা দেখায় খুব তারা স্মার্ট।
মাথায় যত চুল আছে ভাই, ছোট করে কাটা
মেয়ে হয়েও সাজছে তারা লাট সাহেবের ব্যাটা।
রূপের গৌরব করে তারা হয় যদিবা ফর্সা
হাজার ছেলেকে জ্বালিয়ে মারে, দেয়না কারো ভরসা।
কোন বাধা মানে না তারা, ট্রেনে ট্রামে বাসে
তিরিশ দিনে ছত্রিশবার সিনেমা দেখে মাসে
রাস্তা দিয়ে চলে যখন দেখনে একটা বুড়ো
দূর হতে টিটকারি মেরে বলে ওহে খুড়ো।
কোথায় যাচ্ছো সিনেমায় ? না থিয়েটারে হলে ?
হিঃ হিঃ করে হাসতে থাকে দাঁত দুপাটি খুলে।
তবুও কিছু যাবেনা বলা কলি যুগের মেয়ে
বললে কিন্তু মরতে হবে জুতোর বাড়ি খেয়ে।

পূজোর বার্তা

রীনা দেবনাথ (বি.এ-প্রথম বর্ষ)

শিউলি ঝরা ভোরের বেলা
রাশি রাশি ফুলের মেলা
গন্ধে মন আকুল করে
এমন সময় উমা মাকে মনে পড়ে ॥
পুজো মানেই শরতের ঐ
নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা
কাশ ফুলের দোল আর শিউলি ফুলের মেলা ॥
পূজো মানেই ঢাকের কাঠি
ঢাকেতে রোল তোলে
তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে
কাঁসিটি তার বাজে ॥
পূজো মানেই প্রথম দেখা
প্রথম পরিচয়।
পূজো মানেই ঘরে আপন জনের ফেরা।
পূজো মানেই কাজের ছুটি
মায়ের স্নেহের পরশ।
পূজো মানেই ছোট্ট বেলার
দিনগুলিতে আবার ফিরে যাওয়া
মিষ্টি হাঁসির দিনগুলিকে
আবার ফিরে পাওয়া ॥

নবীন বরণ

রেশমা খাতুন
(বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৩৯১)

সভাপতি মহাশয়কে
প্রথম অভিনন্দন
শিক্ষক ও অশিক্ষক
আর পরে জনগন।
সবার শেষে ছাত্র-ছাত্রী
ভাইও বোন
উদ্দেশ্য যেটা বলার
তা নবীন বরন।
জানেন ? নবীন বরণ উৎসব
খুব তাৎপর্যপূর্ণ
লোক সমাগম ফুল চন্দন
সব নবীনের জন্য।
নবীনদের আজ মিলিয়ে দিতে
পুরাতনের সাথে
কপালে দেয় চন্দন টিপ
ফুল গুজে দেয় হাতে।
মুখে পুরে দেয় মিষ্টি
হাত বোলায় কেশে
এক সুত্রে গাঁথে প্রান
শুধু ভালো বেসে।

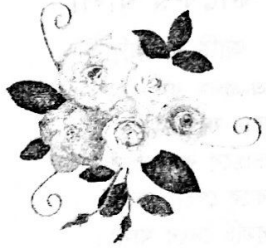

মহান নেতা নেতাজী

আরাবুল মোল্যা (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৬৯৬)

নেতাজী তুমি এদেশের মহান নেতা,
তীক্ষ্ণ অস্ত্র তোমার স্বাধীনতার কথা।
স্মরনে তুমি মোদেরে আছো যুগে-যুগে
তোমার লাড়ইয়ে স্বাধীনতা পেয়েছি এযুগে।
" তোমরা আমাকে রক্তদাও
আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব"–
তোমার এই মহান দৃঢ় উক্তি,
বেয়োনেটের থেকে আছে অনেক শক্তি।
তুমি ইংরেজ বন্দী হয়েছিলে ঘরে
কৌশলে ভারত ত্যাগ করলে স্বাধীনতার তরে।
তুমি ভেঙেছো কঠিন পাথর বাধা,
তুফান বেগে তাই এগিয়েছো সদা।
স্বাধীনতার ঝড় তুলে দিয়েছো এদেশে।
শাসন বিস্তারের জাল ইংরেজ গুটিয়েছে শেষে।
তুমি এসেছিলে ভারতের মুখে হাসি ফোটাতে
এসেছিলে পরাধীনতার গ্লানি কাটাতে,
স্বার্থক হয়েছে তোমার সেই স্বপ্ন,
ভারতে তাই আজ স্বাধীনতার শুভলগ্ন।
দেশপ্রেম তোমার মহান আদর্শ
নতুন আলোয় ভরা তাই আজ ভারতবর্ষ।
স্বাধীনতার লাল সূর্যের উদয় তোমার তরে
তোমার গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি ভারতের প্রতি ঘরে-ঘরে।

কাকের বাসা

আজিজুল মল্লিক
(বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৩৬০)

নন্দী খুড়ো ফন্দি আঁটে
ভাঙবে কাকের বাসা।
চামটি করে খেয়ে দেয়ে
ঘুমটি দেবে খাসা।
কাছা এঁটে খুড়ো শেষে
গাছের মাথায় চড়ে।
এক নিমেষে কাকের বাসা
নিচে খসে পড়ে।
কাকের মাসি কাকের পিসি
কাকের মত ছানা।
উড়ে দিয়ে খুড়োর ঘরে
দিল সবাই হানা।
কাকের মিছিল কাকের মিটিং
কান যেন ঝালা পালা।
শিক্ষা যেন নন্দী খুড়োর
লাগন কানে তালা।

জিজ্ঞাসা

দীপু চন্দ্র মন্ডল (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৫২০)

যদি প্রশ্ন করে বসো জীবন কী ?
বলবো তোমায় নিয়ে লেখা একটি ছন্দ,
অথবা বেদনার মাঝে খানিকটা আনন্দ ॥
যদি প্রশ্ন করে বসো মরণ কী ?
বলবো কুয়াশায় হারানো তোমার ছবি,
অথবা কালো মেঘে ঢাকা অসহায় রবি ॥
যদি প্রশ্ন করে বসো ভালোবাসা কী ?
বলবো স্বপ্নের স্মৃতি বাস্তবে পাওয়া
অথবা অজানা কোথাও হারিয়ে যাওয়া ॥
যদি প্রশ্ন করে বসো হৃদয় কী ?
বলবো দুটি ভিন্ন মানুষের একই অঙ্গ
অথবা লজ্জায় লাজুক দুটি আঁখি ॥
আর তাই ইচ্ছে হয়–
মরণ পর তোমাকে হৃদয় জুড়ে রাখি,
অথবা পলক মেলেই তোমাকে দেখি ॥

একাকার

অর্ধেন্দু দাস (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৮৪৭)

জানলা খোলা রোদের আলো
মিস্টি লাগে মনে,
সবুজ গাছে পাখীরা বসে
কোন পাখি যায় বনে।
পাখির ডাকে ওঠে খোকা
ভোরের বেলা হলে।
ঘাসের উপর শিশির কনা।
কত লোক যায় চলে।
নদীর ধারে মৃদু বাতাস
ঢেউয়ের ফেনা ওঠে।

দূর আকাশের মেঘগুলি
কোথায় যেন ছোটে।
কালো মেঘের দল পাকিয়ে
দেয় যখন মোদের হানা
মোরা তখন খেলায় পাগল
কে শোনে মা-র মানা।
জানলা খোলা রোদের আলো
মিষ্টি লাগে মনে
সবুজ গা পাখি।

গান্ধী

রুহুল আমিন (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৬৮৮)

তুমি থাকতে যদি আজ থাকত না হানা-হানি।
তুমি থাকতে যদি আজ হত না খুনো-খুনি।
তুমি থাকতে যদি আজ হত না রক্তের হোলি খেলা।
তোমার দ্বারা দূর হত জাত-পাত।
তোমার বানী করত আজ শান্তির আহ্বান।
যারা এ বিশ্বকে করে তুলেছে বিষময়,
তোমার বানী আনত তাদের মনে বিস্ময়।
তুমি করেছিলে যেমন করে শান্তির বানী প্রচার।
আজকে আবার ভরিয়ে তোলো শান্তির মহিমায়।
তোমার বানী হোক আজকের মূল মন্ত্র।
তোমার বানীতে ভরিয়ে তোলো এ বিশ্বকে।
তবেই তো বিছানা হবে শান্তির বিছানা।
তোমার মন্ত্র হোকনা আজকের দিনের অস্ত্র।
তবেই তো পাওয়া যাবে শান্তির মূল মন্ত্র
তবেই তো পাওয়া যাবে নবযুগের শান্তির সেই ঠিকানা
তুমি এসো ফিরে আজ আমাদের মাঝে
তোমার চিন্তা ভাবনা দাওনা উজাড় করে
যাতে দুর হয় আজকের দিনের সম্রাজ্যবাদী চেতনা
তুমি এসো ফিরে শান্তির দূত হয়ে।
যাতে হয়ে ওঠে আজকের পৃথিবী শষ্যশ্যামলা।

বিধাতার বিধান

ডলি কর্মকার
(বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৯৫)

গোলাপ ফুল হয় আনন্দদায়ক,
তেমনই কাঁটা হয় বেদনাদায়ক,
মানব হৃদয় যেমন সুখদায়ক,
প্রেম হয় কষ্টদায়ক।
চিরকালই তাই বাঁচতে হয়
বিধাতার বিধান নিয়ে।
পথ চলতে হোঁচট খায়,
সাবধানে না গিয়ে।
চিন্তে গিয়ে পৃথিবীকে
বুঝলাম এক অর্থ
যে অর্থের মানেটা
আজও খোঁজা শক্ত ॥

মিটলো দাদুর বিয়ের সাধ

মোঃ হাবিবুর রহমান দফাদার
(বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৭১৯)

আমার দাদুর সাধ জেগেছে করবে আবার বিয়ে
বরযাত্রী যাবে দাদুর, ব্যান্ড পার্টি নিয়ে।
দাদু আমার বাচ্চা বটে, মুখে হেঁক দাঁত
কচি ছেলের মতো করে কায় দুধ আর ভাত।
বয়স তার খুব বেশি নয় সত্তর কি আশি
বিয়ের কথা শুনলে দাদুর, গোঁফের কোনে হাসি।
দাদু বলে করবো বিয়ে সুন্দরী মেয়ে ভাই মটার
সাইকেল কালার, টি.ভি, নগদ টাকাও চাই।
দেশের ঘটক ফটক নিয়ে, আসে দাদুর বাড়ী
এসব মেয়ে চলবে নাকো বলে নেড়ে দাড়ী।
কেমন মেয়ে চলবে দাদুর বোঝাই বড় দায়
ফেল মেরে সব ঘটকেরা বড়ী চলে যায়।
নিজেই দাদু খুঁজতে মেয়ে গেল কলকাতায়
রংবেরকম মেয়ে দেখে ঘোরে শুধুই মাথা।
দেখলো দাদু আসছে, হেঁটে সুন্দরী এক মেয়ে
কাছে গিয়ে বলল তাকে, করব তোমায় বিয়ে।
এই পেয়েছি এই পেয়েছি, আকাশের এক চাঁদ
এক চড়ে মিটিয়ে দিল, দাদুর বিয়ের সাধ।

প্রার্থনা

রেহানা খাতুন
(বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-২১৭)

বিশ্ব স্রষ্টা প্রভু তুমি
রহিম রহমান
কেউ বা ডাকে আল্লা বলে
কেউ বা মেহেরবান।
কেউ বলে ইশ্বর আর
কেউ বলে ভগবান
সকলকেই করেছ তুমি
তোমার প্রেমদান।
বহু নামে নাম তোমার
ডাকলে সাড়া দাও
তুমি সবার মনের কথা
এক মুহূর্তে জেনে নাও।
দুনিয়াতে মানব রূপে
পাঠিয়েছ আমায়
তাই তোমার দরবারে
সালাম জানাই বারংবার।
চক্ষু দুটি দান করিলে
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখার তরে
হাত দুটি দিয়েছিলে তাই
কর্মকার মন ভরে।
পা দুটি দিয়েছিলে তাই
হাটছি কেমন চমৎকার
তোমার মত বৈজ্ঞানিক
কোথাও নেই আর।
সৎ পথে করি ও তুমি
আমার বিচরন
অসৎ পথে হয় না যেন
আমার আগমন।

এক পলকে একটু দেখা

এম. কে. মিদ্যা

শত সহস্র সূর্যির মাঝে পৃথিবীর অপরূপ রূপে।
শুধু দেখেছি তোমায়;
আকাশের লক্ষ তারাতে চন্দ্রের মুচকি হাসিতে
শুধু দেখেছি তোমায়;
সুগন্ধি ফুলের কোমল কুঁড়িতে ভোঁ ভোঁ ভোমরার সুমিষ্ট গতিতে
সত্যিই পেয়েছি তোমায়;
রিমঝিম জোনাকীর মৃদু মৃদু আলোতে পতঙ্গরাজ প্রজাপতির সুন্দর ডানাতে
সত্যিই পেয়েছি তোমায়;
সুদূর পাহাড়ের ঝর্ণার নির্মল হাসিতে তপনের ঝিকমিক আলোতে
দেখেছি তোমায়;
ফুল্টন্ত পুষ্পকাননে তার বিহগের মনমুগ্ধ গানে
শুধু দেখেছি তোমায়;
সু-প্রভাতের মনোরম বাতাসে পুষ্প কাননের সুবাসে
শুধু পেয়েছি তোমায়;
ভুবনের কোনে কোনে সৃষ্টির রঙবেরঙে
সত্যিই দেখেছি তোমায়;

প্রার্থনা

রুপা পারভিন

হে প্রভু,
সবাইকে সুখ দাও
দুঃখ দাও মোরে,
সবার সুখে সুখী হব
দুঃখ বহন করে ॥
সবাইকে দাও গোলাপের সুখ
কাঁটার ব্যাথা মোরে,
এই মিনতি তোমায় প্রভু
করি করজোড়ে ॥
তোমার ব্রতে ব্রতী যারা
ধন্য তারা ধন্য,
শুধু তাদের কষ্টটুকু
রেখো আমার জন্য ॥
বহুজনে অন্ধ, আঁখি দুটি বন্ধ,
শুধুই ঝরে অশ্রু বৃষ্টি,
আমায় তুমি অন্ধ করে
তাদের দাও দৃষ্টি ॥
নয়ন মেলে দেখুক তারা
একি তোমার অপরূপ সৃষ্টি ॥

ভন্ড মস্থান

উম্মা রেশমা (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৪৩৩)

শান্তির ধরিত্রীতে আজ অশান্তির বারি
বর্ষন করে চলেছে দেশদ্রোহী ভন্ড মস্তানের দল
এরা অজ্ঞ-নেই কোন অক্ষর জ্ঞান,
অপারের বল শক্তি নিয়ে করছে বহন ছুড়ছে মরণবান
এদের নেই কোন ধর্ম, কর্ম, নেই কোন মনুষ্যত্ব জ্ঞান
আছে শুধু মস্তানি।
পূর্ব-পুরুষের ধর্মকে তারা চিরস্থায়ী করার জন্য
রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে বিন্দু মাত্র বিচলিত হয় না।
কিন্তু তারা জানে না- তাদের ধর্ম কী ?
শুধু তারা জানে তাদের ধর্ম সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ।
কিন্তু তারা দিনে একবার ও ধর্মের অক্ষর পাঠ করে না
সকল ধর্মের অর্থ একই-শান্তি
তবে কেন দেশদ্রোহী রক্তের প্লাবন বইয়ে যাও
হে ভন্ড মস্তানের দল তোমাদের ও এদিন
দিতে হবে ভুলের মাসুল।
মানব স্মৃতির অন্তরালে তখনই বুঝিবে
কঠিন বাস্তবের পরিনতি কী ?
তখনই তোমাদের বিবেক পুড়িবে অগ্নি শিখায়।
আর দিনে দিনে তোমাদের স্বপ্ন জীবনের ভীত
খসে খসে পড়বে অন্ধকারের কাল কুটিরে।

মেয়ের বিয়ে

রুবিনা খাতুন
(বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৯১)

মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে
গেল আমার জাত,
আমার ঠিকানা তাই শুধু ফুটপাত।
লক্ষ টাকা নগদ দিলাম
দিলাম কানের দুল
এছাড়াও পাত্রের দিলাম
আংটি বোতাম ঘড়ি
যৌতুকে আরও দিলাম
সল্টলেকেতে বাড়ী।
টি.ভি ফ্রিজ তাও দিলাম
রুপোর বাসন দানে
চুপি চুপি বেয়ান আমায়
বলল কানে কানে।
ছেলের আমার ইচ্ছা বড়
চড়বে মোটর গাড়ী
এটা এমন নয়ত কিছু
নয়তো ভাড়াবাড়ী।
তাও দিলাম বেচে আমি
বাড়ী জমিজমা
রইল শুধু পাছার কাপড়
পরনে এই জামা।

বিদ্রোহী বীর

রেহানা খাতুন (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-২১৭)

হে মোদের বিদ্রোহী বীর
তুমি ভারতের শির
তোমাকে করি শত প্রনাম
তুমি ভারতের প্রান।
২৩শে জানুয়ারী জন্ম তোমার
উড়িষ্যার কটক শহরে
কটকের মাটি ধন্য হল
তোমার পদার্পনে।
অগ্নির শত গর্জন
তোমারই আহ্বান
জোয়ারের মত ছিলে
তুমিই চলমান।
তোমার আহ্বানে
ইংরেজ গেল হেরে
তোমার আহ্বানে
ভারতের মাটি উঠল নড়ে।
তোমার বীরত্বের প্রমান
সারা আকাশে বাতাসে
তোমার বীরত্ব ছড়িয়ে আছে
সমস্ত ভারত বর্ষে।
তোমার ধ্যান-জ্ঞান ছিল
ভারতকে স্বাধীন করা
তোমার তরে পেয়েছি আমরা
এই স্বাধীন ধরা।
১৯৪১ সালে গেলে তুমি
কোথায় হারিয়ে
আর দেবা দাওনি
তুমি কখনও।
হে মোদের নেতাজী
তুমি দেবা দাও একবার
ভারতকে তুমি নতুন সাজে
সাজিয়ে তোল আবার।
হে বিপ্লবী বীর
তুমি একবার ভারতে ফেরো
তোমার আসন শুন্য আজ
হে বীর পূর্ণ করো।

দিনের স্বপ্ন

তরুন কুমার বিশ্বাস (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৭১৬)

'জীবন্ত ফুলের গন্ধে,'
দুপুরের মলিন স্বপ্ন ছিড়ে গেল।
জেগে দেখি আমি বিছানাতে আছি ।
ফুল নেই মোর আশে পাশে।
এসেছে আমার ঘরে ছোট এক রঙ্গিন প্রজাপতি ।
বিভিন্ন ফুলের রঙে ডানাদুটি হয়েছে রঙ্গিন,
ফুলের দেশে ঘুরে ঘুরে ফুলের রঙ গায়ে নিয়ে।
সেজেছে এক ছদ্ম বেশী রুপসী ।
পরাগ সংযোগ গটিয়ে ফুলের বংশ বৃদ্ধি করে।
জগৎটাকে দিয়েছে ভরিয়ে ।
চারিদিকে প্রকৃতি নিস্তব্ধ।
তারি মাঝে এসেছে এক রঙ্গিন প্রজাপতী ।
দেখে মনে হয় সমস্ত আকাশ আর পৃথিবীটা।
আমার ঘরে তুলে নিয়ে এল,
কোথাকার এক ছোট প্রজাপতী ।

মনে পড়ে

দীপঙ্কর সরকার (বি.এস.সি-প্রথম বর্ষ, রোল-১২১)

মনে পড়ে সেদিনের–
এক সাথে পাঠশালার পথে
টিফিন ব্যাগে মত্ত দু-জনা,
কখনো হাসি, কখনো অভিমান,
চোখের আড়ালে মন দেওয়া-নেওয়া,
মনে হয় জীবনের জন্য জীবন।
মনে পড়ে সেদিনের–
পুতুল খেলার ছলে বর–বউ সাজা,
খেলা ঘরের গৃহিনী হওয়া।
অশান্তির জেরে খেলা ঘর ভাঙা।
ব্যস্ততা ফেলে কাছে এসে দাঁড়ানো,
মনে হয় একে অপরের পরিপূরক।
মনে পড়ে সেদিনের
এক সাথে হাত ধরে পথ চলা,
অকারণে তোমার বাড়ী যাওয়া,
মিথ্যা অজুহাতে তোমায় ডেকে আনা।
দুপুরে বকুল ফুলের মালা গাঁথা।
মনে হয় শত সিদ্ধ-পূর্ণ এ মিলন।
মনে পড়ে সেদিনের
তুমি তোমার মন হৃদয় দিলে সমর্পন,
তোমার সুরভা ও প্রেমের ঐশ্বর্য দিয়েআপন করেছিলে।
নির্জন অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে কে যেন !
হৃদয় কমলে শুধু উড়ে চলে অসিম হরকে,
মনে হয় স্বপ্নময় এ মধুর মিলন।
আর আজ, সেদিনের তুমি
তোমার শঙ্কিত হৃদয়ে লজ্জিত দৃষ্টি
জীবনে প্রথম অপরূপা এক অনুভূতি,
তুমি এলোকেশে ঘাতক বেশে–
ডাগর চোখে নগ্ন দৃষ্টিতে তুমি অনন্য,
আজ ও মনে পড়ে সেদিনের সেই তুমি।

বন্ধু

লিজা খাতুন
(বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৬০)

কে বলছে বন্ধু নেই,
বন্ধু আছে সব খানেই।
বন্ধু এসে দাঁড়াবে পাশে
ধরবে হাত, হাত বাড়ালেই ॥
তোমার ব্যথায় কাঁদবো আমি
আমার সুখে হাসতে পারো
তোমার জয়ে হবো জয়ী
যদি দু:খের ভাগ নিতে পারো।
মন অভিমান, বাধা নিষেধের বেড়া
মুছে যাবে কাছে এলেই।
কে বলছে বন্ধু নেই,
বন্ধু আছে সব খানেই ॥

যাযাবর

মোঃ গফ্ফার আলি

এ ধরায় নির্দিষ্ট বিন্দুতে
আমাদের ঠাঁই নাই,
মেঘলা আকাশ আর
বজ্রের হুমকিতে ডরাই না।
সব ঋতুতেই গন্ডারের চামড়ার
উপর দিয়ে বয়ে যায়,
উদভ্রান্তে, লক্ষ্যভ্রষ্ট, দিগন্তহীন
পিপীলিকার মত উড়ে চলা,
প্রতি মুহূর্তে জীবন সংশয়ে
বেঁচে থাকা।
দরদী রাজা মহারাজার রাজ্যে
আজও বাস্তুহীন,
গন্য, মান্য, নেতাদের মানবিকতায়
আমি, তুচ্ছ, অতি নগন্য
প্রজাতির সমান ॥

শরৎ

মিয়ানুর গাজী (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৫৭৮)

নীল আকাশের অঙ্গনে সাদা সাদা মেঘের আনাগোনা
রোদ-ছায়ার লুকোচুরির মাঝে কখনো-সখোন দু-এক পশলা বৃষ্টি।
মাঠে মাঠে কাশফুলের সমারোহ,
ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দুর সঞ্চয়,
ভরা দিঘির মাঝে পদ্ম, শালুকের বাহার-
মন আকুল করা পূজোর ছুটির বাঁশি।
ক্ষেতে ক্ষেতে শারদোৎসবের প্রতীক্ষায় মগ্ন কচি ধান গাছ,
উত্তরে হিমেল হাওয়ার হালকা ছোয়া
চারিদিক থেকে আসে শিউলিফুলের মন মাতানো গন্ধ।
মা-দুর্গার আগমনী বার্তার ঘসনা চারিদিকে,
আগত উৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সকল মানুষ,
ক্লাস ঘরের মধ্যে ছুটির অপেক্ষায় নিস্তব্ধ পড়ুয়ারা।
চতুর্দিকে প্রকৃতির মনমহিনী রূপ
ছুটির অবকাশ।
সে কি অপরূপ রূপ-বিস্তার শরতের।

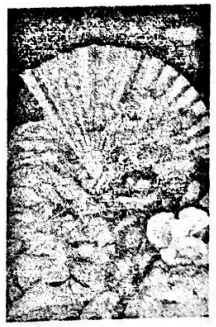

শরৎ কাল

বিকাশ মন্ডল
(বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-৪১)

শরৎ কালে
ভোরের বেলায় ॥
শিশির জমে
ঘাসের ডগায় ॥
শিউলী ফোটে
বনে বনে ॥
ভরে ওঠে
মধুর সুগন্ধে ॥
বাতাসের তালে
কাশফুল দোলে ॥
বেল, জুঁই, তাই
মাথা তুলে চাই ॥
পরিবেশ সাজে
নতুন রূপে ॥
মনেতে জাগে
পূজা এসেছে ॥
বাতাসে ভাসে
ফুলের গন্ধ ॥
ছোটদের মনে
জাগে আনন্দ ॥
শরৎ এসেছে
পূজার ঘন্টা বেজেছে ॥
ঢ্যাং কুরা কুর ভাবে
বাজনা বেজেছে ॥

পরবর্তী ভূবন

মাসুদ করিম মিদ্দা (বি.এ-প্রথম বর্ষ)

জানি না,
এ নব সভ্যতা ধারিত্রীতে আমাদের অক্ষিপটে স্টাচুর মত চিরস্থায়ী থাকবে-কিনা;
জানি না, সমস্ত স্থান একদিন হবে কিনা আফগানিস্থান;
জানি না, সব সীমা একদিন হবে কিনা জাপানের হিরোসীমা;
জানি না, থর মরু একদিন ভূমি হবে কিনা সাহারা;
জানি না, সু উচ্চ হিমালয় পর্বতমালা আবার ডুব দেবে কিনা–টেথিস সাগরে;
জানি না,আমাদের বলিষ্ঠ হাত হবে কিনা একদিন হিংস্র হাতিয়ার;
জানি না,আমাদের নখ হয়ে যাবে ধারালো মারণাস্ত্র ছুরি;
জানি না,আমাদের মুখ হয়ে যাবে কিনা একদিন মুখোশ;
জানি না,কবিতা লেখার জন্য থাকবে কিনা কোন বিখ্যাত কবি;
জানি না,ইতিহাস লেখার জন্য থাকবে কিনা কোন ঐতিহাসিক;
জানি না,ভূগোল লেখার জন্য থাকবে কিনা কোন ভূগোলবিদ;
জানি না, প্রবন্ধ লেখার জন্য থাকবে কিনা কোন প্রাবন্ধিক;
জানি না, ব্যকরণ লেখার জন্য থাকবে কিনা কোন খ্যতনামা–বৈয়াকরনিক;
জানি না, পৃথিবী ধ্বংস পর্যন্ত থাকবে কিনা সব ভালোবাসা;
জানি না,একদিন শেষ হয়ে যাবে কিনা সব জিজ্ঞাসা;
সত্যিই আমরা জানি না,
সেই সময় কোথায় হবে মোদের ঠিকানা ?

নাটক

অনুকরণ করিবার সহজাত প্রবৃত্তি হইতে নাটকের উৎপত্তি মানুষ অপরের কথা ভাব ভঙ্গি লক্ষ করিয়া পুরনরায় তাহা নকল করিতে ভালোবাসে। এই প্রবৃত্তি আদিম অসভ্য মানুষ হইতে বলিয়া আসিয়াছে।

It is a literature that walks and talk before our eyes.

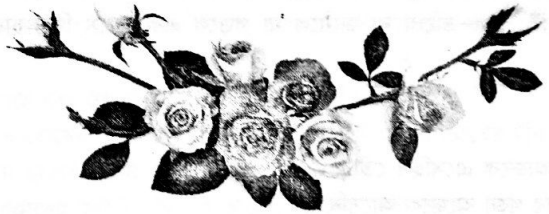

"সর্বনাস"

মোঃ কুতুবউদ্দিন আলি মোল্যা (বি.এ-প্রথম বর্ষ, রোল-১৩৪)

[সময় ১১টা ছাত্র-ছাত্রী সবাই ক্লাসে উপস্থিত কিন্তু ক্লাসে শিক্ষক আসছেননা ক্লাসের ছাত্র টেপা বাহিরে এসে পুন:রায় ক্লাসে প্রবেশ করে]

(১)

টেপা : এই জগাই-মগাই, নন্টু-ফন্টু, ফজা-গজা সবাই বস।

ফজা : আরে এই টেপা কি ব্যাপার।

টেপা : স্যার ক্লাসে আসছেন না ভেবে স্যারের কাছে গিয়ে ছিলাম স্যার উপরে ক্লাস নিচ্ছে তাই স্যার কিছুক্ষন আমাকে ক্লাস নিতে বলল।

ফজা : তাহলে তুই আমাদের স্যার।

টেপা : স্যারই তো- এই তোরা চোখ বুজিয়ে পড় আর বিনা কলমে লেখ নাম্বার এর দায়িত্ব আমার।

ফজা : টেপা যে ভাবে ভাষন দিচ্ছিস মনে হয় তুই সত্যি স্যার।

টেপা : এই ফজা কি ভাবিস আমার জীবনে কত বার না পিন্সিপালের চাকরি এল আর গেল। এই সামান্য স্যার টুকু আমাকে ভাবতে পারিস না।

ফজা : তা ঠিক রে, তুই এগারো ক্লাস কম উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলে প্রিন্সিপালের চাকরি মানায় তোরে বাথরুম কোম্পানির চাকরি করার দরকার।

টেপা : সত্যি তোর মতো বন্ধু হয় না। তুই আমার জন্য কত ভাবিস।

ফজা : আয় এখানে আয়, এলে সিগারেট খাও।

টেপা : এই ফজা ক্লাস ওয়ানে সিগারেট খাব ?

ফজা : আরে সিগারেট খাওয়ার একটাই নিয়ম, শিক্ষকরা সিগারেট খান বাথরুমে এটা শিক্ষকের কর্তব্য, ছাত্রদের ক্লাস রুমে সিগারেট খাওয়া এটা ছাত্রদের কর্তব্য।

টেপা : সত্যি তো অনেক কিছু জানার আছে ফজা।

ফজা : তা সবাই বলে-ভালো না জানলে না পড়লে এক ক্লাসে তিন-চার বছর করে থাকি কিভাবে।

(২)

[শিক্ষকের প্রবেশ]

শিক্ষক : ফজা আজকে এসেছিস তোরা।

ফজা : না স্যার গজা আজকে আসেনি।

শিক্ষক : ফজা আমি তোর নাম করেছি।

ফজা : আমি সে কথা বুঝিনি।

শিক্ষক : ফজা তোর বাবার সঙ্গে কয়েক দিন ধরে দেখা হয়নারে।

ফজা : দেখা আর হবেনা স্যার যে...

শিক্ষক : কি হয়েছে তোর বাবার।

ফজা : বাবা এখন মোবাইল কিনে শুধু হ্যালো আর হ্যালো... কারো সঙ্গে দেখা আর হয়না।

শিক্ষক : তাহলে আরো ভাল হল রে, নাম্বারটা বলতো আমি কথা বলে নেব।

ফজা : না স্যার নাম্বার দিতে পারবো না।

শিক্ষক : কেন নাম্বার দিতে পারবিনা ?

ফজা : স্যার আমি একটা মেয়েকে ভালবাসি তাকে ফোন নাম্বার দিই ফোনে প্রতিদিন দু-জনে কত ভালবাসার গল্প বলি, একদিন বাবা ফোনটা তোলেন মেয়েটি আমি ভেবে আরো সুন্দর সুন্দর ভালোবাসার কথা বলে, বাবা সেই সুন্দর ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে যায়, তাকে বাবা ভালো বেসে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে আসে তবু আমি বাবাকে বলি বাবা এ-মাল আমার। চড় মেরে বলে তোর মাল থেকে 'ল' বাদ দে...। ভেবে দেখি 'মা'। সেই দিন থেকে কাউকে আর নাম্বার দিই না।

শিক্ষক : আচ্ছা আমি সময় করে কথা বলে নেব- কাল ক্লাস পরীক্ষা হল তুই এলি না কেন ?

ফজা : স্যার আমার মায়ের খুব জ্বর... তাই মা আমাকে বলল-ফজা তুই ক্যাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়। আমি বাজার থেকে ওষুধ নিয়ে আসি।

শিক্ষক : আচ্ছা... আচ্ছা বুজেছি- টেপা তুই কাল এসেছিলি ?

টেপা : না ! স্যার।

শিক্ষক : আসিসনি কেন ?

টেপা : স্যার একটা ছেলের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম

(৩)

শিক্ষক : জানোয়ার কোথাকার এখন থেকে ছেলেদের সঙ্গে সিনেমা দেখা হচ্ছে। মেয়েদের সঙ্গে দেখতে পারোনা ?

টেপা : স্যার আর কোনো দিন ভুল করবো না।

শিক্ষক : এই ... পড়া করেছিস-....? বলতো মনোপ্রাণ কাকে বলে ?

টেপা : স্যার আপনার বৌয়ের নাম জানো, আপনার মেয়ের প্রতি আমার প্রাণ, একে বলা হয় মনোপ্রাণ।

শিক্ষক : ঠিক আছে তো দেখছি, ফজা বলতো হারমোনিয়া কি ?

ফজা : আপনার বৌয়ের গলার হার, আর আপনার মেয়ে আমার চোখের মনি আর প্রিন্সিপাল-এর গাছের আম হারমোনিয়াম।

শিক্ষক : সত্যি তোদের আউট বুদ্ধি খুব ভালো, তোদের চেষ্টা আছে।

ফজা : চেষ্টা না করলে স্যার প্রতি বিষয়ে এমনই শূন্য পাই ?

শিক্ষক : শূন্য.... আজাকাল অনেক দাম আছে।

টেপা : ই-এ-এস স্যার।

শিক্ষক : এবার টেপা বল, আমরা ইতিহাস পড়ি কেন ?

টেপা : আমরা পড়ি আমাদের দেশে কত রকম হাঁস আছে, যেমন রাজহাঁস, পাতিহাঁস, পেরিহাঁস এদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য আমরা ইতিহাস পড়ি।

শিক্ষক : ফজা বলতো পৃথিবীর আকৃতি কেমন ?

ফজা : স্যার ফুচকার মতো।

শিক্ষক : ফুচকা কেন ?

ফজা : পৃথিবী যেমন গোলাকার তেমনিই গোলাকার। পৃতিবীতে তিন ভাগ আর একভাগ স্থল থাকে তেমনি ফুচকাতেও তিনভাগ জল ধরে এক ভাগ খালি থাকে।

শিক্ষক : সত্যি তোদের চেষ্টা আছে।

টেপা : স্যার তবু তো আমরা চেষ্টা করে কত প্রশ্ন-উত্তর দিলাম, এবার আপনি একটা গল্প বলুননা।

ফজা : ঠিক বলেছিস টেপা, গল্প বলতেই হবে, না বললে শুনবোনা।

শিক্ষক : কি গল্প বলি বলতো ফজা....

টেপা : স্যার যেকোন একটা গল্প বলুন।

ফজা : স্যার আপনি বলেছিলেন একদিন তোদের একটা কাঁনা খোঁড়া, ফোকড়া ও ফকিরের গল্প বলবো, স্যার সেই গল্পটা বলুন।

টেপা : স্যার তাহলে সেই গল্পটা বলুন।

শিক্ষক : ঠিক আছে বলছি, ভালো করে শোন তাহলে কানা, খোঁড়া, ফোকড়া ও ফকিরের গল্প....ঢং..ঢং..ঢ॥ দেখলি তো আজও হলো না। কাল বলবো।

টেপা : এ কি রে!

মাষ্টার মহাশয়

গৌরাঙ্গ মন্ডল (বি.এ-দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-২৬৫)

[মাষ্টার মহাশয়-তার ছাত্র-দিনু,বিশু ইত্যাদি ছাত্রদেরকে পড়া ধরছেন]

মাষ্টার মহাশয়-

আচ্ছা দিনু আজকের বিষয় টা কি ছিল ?

দিনু : স্যার আজকের বিষয় টা ছিল কৈশোর কাল।

মাষ্টার : ঠিক বলেছো তুমি, বসো, তাহলে নিশ্চয় সবাই ভালো পড়া করেছে। তাহলে তুমি বলো বিশু কৈশোর কাল কাকে বলে। এর সংজ্ঞা দাও।

বিশু : স্যার, পুরানো কৈশোর কাল না নতুন কৈশোর কালের সংজ্ঞা দেব।

মাষ্টার : নতুন আর পুরানো কি, কৈশোর কালের সংজ্ঞা বলো।

বিশু : বলছি-এটা আবার কোন কঠিন প্রশ্ন হলো নাকি।সুমদ্র তরঙ্গের ন্যায় ছেলে এবং মেয়ের হৃদয় যখন প্রেমের জোয়ারে ভেসে ওঠে ও একে অপরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে আর মাঝে মাঝে-পাকিজা, চৈতালি সিনেমা হল রিজার্ভ করে ঐ সময়কে কৈশর কাল বলে।

মাষ্টার : দেখেছো হারাম জাদার কাণ্ড, বলি এসংজ্ঞা কোথায় পেয়েছ, এটা কী তোমার বইতে আছে।

বিশু : স্যার এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এটা বইতে নেই কিন্তু বুদ্ধির জোরেই বললাম। আর আপনি তো কৈশোরের সংজ্ঞা দিতে বলেছেন, আমি তাই দিয়েছি। আমি হরফ করে বলতে পারি-কোন গবেষক এটাকে ভুল বলতে পারবে না, আর আপনি ভুল বলছেন।

মাষ্টার : তাই নাকি এতে আবার যুক্তি আছে। তাহলে তোমার যুক্তি গুলী বলো দেখি শুনি।

বিশু : শুনুন স্যার, আমার প্রথম যুক্তি হল.....১৮বছর বয়সী ছেলে মেয়েরা কোন মূল্যেই তাদের প্রেমকে হারাতে চায় না। তার জন্য তারা সব কিছু ছাড়তে রাজি। মাথা যতই নিচু করতে বলেন না কেন, মাথা নিচু করবে না কেন। কেন জানেন স্যার-

মাষ্টার : কেন শুনি!

বিশু : স্যার মাথার চুল যে ঘেঁটে যাবে, তাই তারা মাথা উচু করে বলে-'পিয়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া' এর ফলে দুটি স্টাইল বজায় থাকে।

১)মাথার চুলের ভাঁজটা ঠিক থাকে, আর

২)প্রেমের কাছে মাথা নত হয় না।

দ্বিতীয় যুক্তি হল-

রাস্তা দিয়ে যখন মেয়েরা যায় তখন ছেলেরা টোন্ট কাটে, হ্যায় - হ্যালো, আরো কত কি? আমি বলি স্যার এসব কী কোন বয়স্ক বা কচি কচারা করে ? বয়স্করা হ্যালো বললে হেলে যাবে শ্বসান ঘাটে। তাই আমার সংজ্ঞা যুক্তি থাকাটা বাচঞ্চনীয়।

মাষ্টার : হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি কথা বলবে তার যুক্তি যুক্ত হবে না তাই কখনো হয়, আচ্ছা বলতো যুক্তি বাদী"লোক" তোমার মতে প্রেম কি স্বাধীন ?

বিশু: স্যার এত খুব সহজ, ভারত বর্ষ বহু দিন আগে স্বাধীন হয়েছে, আর প্রেমটা ভাললাগার মধ্যে তাই প্রেম স্বাধীন হয়েছে।

মাষ্টার : তোমাকে কোন দিন হারাতে পারবো না। এবার আমার শেষ প্রশ্ন ইংরাজীতে-পারবে তো।

বিশু : ভালো পারবো না, তবে আমি হারবো না, ইংরেজরা এদেশে এসে দেশ একেবারে লণ্ড ভণ্ড করেছে, আর তাদের ভাষা সম্মানের সহিত পড়বো, এটা অসম্ভব, তবুও বলুন দেখি।

মাষ্টার : প্রশ্ন হল -"ছেলেটি কূল গাছের নিচে উল্কো মাছ ধরছে" বলো দেখি....

বিশু : স্যার এত আমি অন্যদের ধরি, আর সেইটাই আমাকে ধরলেন-উত্তর টা হল-"উল কূল দি আণ্ডার বয়"

মাষ্টার : মানে, টা, কি ?

বিশু : তাও বুঝলেন না, স্যার-উল মানে-উলকো মাছ, কূল মানে-কূল গাছে, আণ্ডার মানে-নিচেয়, আর বয় মানেতো-ছেলে।

মাষ্টার : সত্যি তুই পারবি। তুই এই মর্ডাণ যুগের শিক্ষক। আমি তোর কাছে হেরে গেলাম।

বিশু : না স্যার, আপনি এখনো হারেন নি, তবে এবারে হারবেন, তাই আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই প্রশ্নটা হল- ..... মানে কি স্যার।

মাষ্টার : (বিরক্ত হয়ে) আমি জানি না,চলি

বিশু : দাড়ান স্যার, এবার আপনি সত্যি হেরে গেলেন, কেন জানেন না, তাই সবাই হাসছে দেখুন স্যার এতে প্রমাণ হয় আপনি হেরে গেছেন।

ষাট বছরে ডিভোর্স

অভিজিত কর্মকার (বি.এস.সি-প্রথম বর্ষ, রোল-৮৫)

১/ কর্তা (হরি চরণ), ২/ চাকর(কানাই),
৩/ গিন্নিমা, ৪/ মাধবী

[ভূমিকা :- কর্তার গিন্নি কর্তাকে উঠতে বসতে ঝাঁটা পেটা করে।তাই কর্তা তার জায়গায় একটু পরিবর্তন করতে চান, মানে গিন্নিকে সরিয়ে তার জায়গায় নতুন গিন্নিকে বসাতে চান। এর ফলে কর্তার নিজের অবস্থা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌছেছিল সেইটাই এই নাটকের মূল বিষয় বস্তু।]

ষাট বছরের ডির্ভোস

.....

কর্তা হরিচরণ :-হ্যাঁ রে কানাই আমার কি বয়স খুব বেশী হয়েছে ? আর মথার চুল, সব কি সাদা হয়ে গেছে?

চাকর/কানাই :-কই না তো, বয়স তো সবে ষাটে পড়েছে।তাতে আর এমন কি হয়েছে, আর চুলে তো কলপ করা, চুল যে সাদা তা একদম যাবে না ধরা।

হরিচরণ :-বলছিস, তাহলে আমার বয়স খুব বেশী হয়নি।

কানাই :-না, না, আপনার বিয়ের বয়সই পার হয়নি, কিন্তু ওই যে ডাইনি, যে কিনা এখনো মারা যায়নি। আপনাকে ঝাঁটা দিয়ে পূজো করেও যার সুখ হয়নি।

মানে তিনি হলেন গিয়ে আপনাদের গিন্নিমা, করেন খুব ভালো রান্না, যিনি কিনা ডালে দেন পেঁয়াজ, আর মাছের তরকারিতে দেন এলাচ।

হরিচরণ :-থাক, থাক, এখন আর তোর রসিকতা করতে হবে না। মানে আমি বলছিলাম কি নিতাই বাবুর মেয়ে টেপিকে তোর কেমন লাগে ?

কানাই :- একি বলছেন কর্তা, গিন্নিমার কানে গেলে একথা তখন বুঝতে পারবেন এর ঠ্যালা, কারে

বলে জ্বালা।

হরিচরণ :-তাহলে কি করা যায় বলতো।

কানাই :এক কাজ করুন, গিন্নি মার গলা টিপে ধরুন। এই না না, তাহলে তো গিন্নিমা মরে যাবে, আর মরে গেলে তো থানা পুলিশ হবে, তার চেয়ে ভালো আপনি গিন্নিমাকে দিন ডির্ভোস, তাতে লাগবে না কোন আক্রোশ।

হরিচরণ :-ঠিক বলেছিস, কিন্তু তোর গিন্নিমা কি রাজি হবেন ?

কানাই :-আমিই করব তার ব্যবস্থা, আপনি শুধু দেখবেন তার(গিন্নিমার) অবস্থা, কিন্তু আমি ভাবছি টেপি কি এই"অল্পবয়সী বুড়ো" মানে আপনাকে কি বিয়ে করতে রাজি হবে ?

হরিচরণ :- হবে হবে, অবশ্যই হবে, আরে মানুষের লোভ বলে তো একটা জিনিস আছে নাকি, বিশেষ করে টাকা-পয়সার লোভ তো অবশ্যই।

কিন্তু তুই আমার হতে চলেছে বউকে টেপি টেপি করে ডাকবি না, তার ভালো নাম হল মাধবী, বুঝলি।

কানাই :- আইজ্ঞা হ্যাঁ, বুঝলাম।

.....

দ্বিতীয় দৃশ্য

(হরিচরণের গিন্নি বাপের বাড়ীতে বেড়াতে গেছে, আর সেই সুযোগে হরিচরণ বাবু মাধবীকে তার ঘরে উপস্তিত করেছেন)

.....

হরিচরণ :-বোসো মাধবী, এই কানাই,কানাই.....

কানাই :-(ভিতরে থেকে)যাই কর্তা।

হরিচরণ :- দু কাপ চা করে নিয়ে আয়তো।

কানাই :- আচ্ছা দিচ্ছি।

হরিচরণ :- তারপর লেখাপড়া কেমন চলছে।

মাধবী :- ভলোই

হরিচরণ :- বি. এ. পরীক্ষা দিলে তো।

মাধবী :- আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আপনি আমাকে এখানে নিয়ে আসলেন কেন ?

হরিচরণ :- চা খেয়ে নাও, তোমাকে ঠিক কি ভাবে কথাটা বলব বুঝতে পারছি না,চায়ের কাপটা নিতে নিতে মানে.....মানে....., চা খেয়ে নাও, মানে আমি তোমাকে...মানে আমি বলছি যে.....এই কানাই বল না।

কানাই :- মানে কর্তা আপনাকে বিয়ে করতে চান, এই আরকি।

মাধবী :- হা-হা-হা, আমাকে হা-হা-হা,তাও আবার কাকিমা থাকাকালীন। তাহলে কাকীমা আপনাকে ঝাঁটা দিয়ে পূজো করবে।

কানাই :- না, না, গিন্নিমাকে ডির্ভোস দেওয়ার পরে, কর্তা আপনাকে করবেন বিয়ে।

হরিচরণ :- হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই।

মাধবী :- কিন্তু কাকীমা কি একথা শুনেছেন, দাঁড়ান দাঁড়ান আগে কাকীমাকে কাকী,কাকীমা.....কাকীমা.....

মাধবী :- এই যে কাকীমা, কাকা আপনাকে ডির্ভোস দিয়ে আমাকে বিয়ে করতে চান।

কাকীমা/গিন্নীমা : বিয়ে, আমি দেখাচ্ছি আজকে। ডিভোর্স অ্যাঁ, ভেবেছো আমি কিছুই জানতে পারবো না। কানাইটা, এই কানাইটা যতনষ্টের গোড়া। কর্তার মাথাটা একেবারে খেয়েছে। বলি বয়সটা কি কম হল। এই বয়সে আমাকে ডিভোর্স দিয়ে আমাকে ঘড়ছাড়া করে টেঁপিকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চাও অ্যাঁ, দেখাচ্ছি আমি আজ কে কাকে ঘরছাড়া করে। [এই বলে রান্না ঘরে চলে যায়]

কানাই : আমি তখনই বলেছিলোম যে কর্তা, গিন্নীমা এখনই পাবেন এ বার্তা, তখন আর রাখো লাগবে না আমি এখন চললাম, আপনি এখন গিন্নীমার ঝ্যাঁটার ঘা সামলান। [এই বলে কানাই ফুটে চলে যায়]

হরিচরণ : এই কানাই, কানাই আমাকে ছেড়ে যাসনা। যাঃ চলে গেল। ওইদিক মাধবীটাও সব দেখে শুনে পালিয়েছে। এখন আমি একা একা কি করি। কি মরতে যে আমি ডিভোর্সের কথা বলতে গেছিলাম। এই ডিভোর্সের কথা শুনেই বোধ হয় ও বেশি ক্ষেপে গেছে। এখন আমাকে পুজো করেই ছাড়বে।

গিন্নী : (একটা মুড়ো ঝ্যাঁটা হাতে করে নিয়ে এসে) কই কোথায় গেল। মুখপড়া মিনসে। বিয়ে করবে অ্যাঁ। বিয়ে করার সাধ আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। (বলে কর্তাকে দুমদাম ঝ্যাঁটার বাড়ি মারতে থাকে)

কর্তা : উলু উলু গেলুম রে। এবারের মত ক্ষমা করে দাও লক্ষীটি।

গিন্নী : লক্ষিটি, ক্ষমা অ্যাঁ। বলি আমাকে ডিভোর্স দেবার কথা ভাবার সময় তো মনে ছিল না। আমাকে ডির্ভোস দেবে অ্যাঁ। ঘড়ছাড়া করবে। ঘড়ছাড়া আজ আমি তোমায় করে দিচ্ছি।

[এই বলে কর্তাকে ঝ্যাঁটার বাড়ি মারতে মারতে ঘরের বাইরে বার করে দিয়ে দরজায় খিল এঁটে দেয়।]

শেষ দৃশ্য

হরিচরণ বুড়ো বয়সে ঝ্যাঁটার ঘা খেয়ে যে তার শেষ পরিণতি কি হয়েছির তা বলা খুবই মুশকিল। তবে শোনা যায় একমাস তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এক মাস পর জানা যায় যে হরিচরণের ভীষণ শরীর খারাপ করেছিল। এবং ঐ একমাস মাধবীই তাকে সেবা শুশ্রুষা করে সারিয়ে তুলেছিল। শেষে হরিচরণ মাধবীর কাছে তার। ভুলও স্বীকার করেছিল।

ওই দিকে গিন্নীমা একা থেকে থেকে একমাস পর যখন স্বামীর খোঁজ পান এবং মাধবীর কাছে ভুল স্বীকারের কথাও জানতে পারেন, তখন তিনি তাঁর স্বামীকে বাড়ীকে নিয়ে আসেন।

ক'দিন পর

ক'দিন পর এক সন্ধ্যা বেলায় কর্তা আর গিন্নীমা দু-জনেই একটা চেনা স্বর শুনতে পান।

শ্রী কর্তা, কর্তা, গিন্নীমা.....।

দরজাটা খোলেন না।

গিন্নীমা গিয়ে দরজা খুলে দেন এবং দরজা খুলে তিনি দেখতে পান তাঁদের পুরানো চাকর কানাইকে।

কানাই : ভাল আছেন গিন্নীমা, আর কর্তা, তিনি কেমন আছেন, শুনেছি তিনি নাকি আবার ফিরে এসেছেন। একথা মাধবী দি-ই অবশ্য আমাকে বলেছেন।

(ভিতর থেকে কর্তা হাঁকছেন, কে গো গিন্নী)

কানাই : আমাকে চিনতে পারছেন না কর্তা। আমি কানাই।

কর্তা :(কাঁদতে কাঁদতে) আমাকে ছেড়ে সেদিন কোথায় চলে গেছিলিরে কানাই, তোর গিন্নীমা সেদিন আমার ঝ্যাঁটার বাড়ি মেরে.....

গিন্নী :থাকনা সেসব কথা। ভুল তো সেদিন আমাদের সকলেরই হয়েছিল। এখন আর সেসব কথা মনে করে লাভ কি।

কানাই :মাধবীদির কাছে আমি সব কথা শুনেছি। আর সেই জন্যই আমি আপনাদের মাঝে আবার ফিরে এসেছি। আর ভেবেছি শেষ জীবনটা আমরা এক সঙ্গে কাটিয়ে দেব।

কর্তা : গিন্নী, আমাদের কোন ছেলে নেই। এতদিন কানাই ছেলের মত ছিল। এখন থেকে ছেলে হয়েই থাকবে।

কানাই :কর্তা, আমাদের এই মিলনে আপনাকে একটা চুপি চুপি কথা বলি শুনুন, আপনার চুল না সব সাদা হয়ে গেছে, আপনি আর একবার কলপ করুন।

কর্তা / গিন্নী : হা হা... হা.....

কর্তা : সত্যিই পারবি কানাই।

কানাই :কর্তা-গিন্নীর ষাট বছরের ডিভোর্সের গল্প, হয়ে গেল সমাপ্ত।

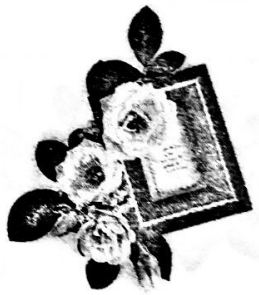

POETRY

'Beauty is Truth, Truth Beauty'-Keats

Natural Beauty

Subrata Mondal [B.A-2nd year]

You are the source of inspiration of poetry.
Season is the inventor of natural activities
Both of you are co-releted with eachother.
Mortality is the law of life,
That's why you are needed
We see your appearance and disappearnce.
It's remarkable change in brigs about the natural surrounding,
We can precieve romance and emotion from this nature,
When it reveals on itself in literature
Nature can teach us as a teacher,
How to love the human in each other.
I feel nature in my mind,
From summer to the winter's wind.
My belief depend on your spirit,
Do you nature live in autumn's dew drops on the green-breath ?
You are in my imagination and in my heart also,
When I see you in spring's moonlight through.
I feel your you on cloudy sky.
Some time I think the prosperity of wonder could't be ful filed any more,
Advantage of experiences would be a sore.
I want to drench my heart and mind in beauty,
I want nature and its beauty to seep in me.

Love Finder

Rukhsana khanam [B.A-(H)]

The Sun promised me
He will come and give me the wine of love
He told-
'At the end of the sky
Where I sleep alone.

Silently I will come and give you a soft kiss.
At the end of the day when birds are on the way home
I will play the sweet song of love.
Riding on thefloating cloud
We will search our destiny.
But it he does not come to me.
My indomitable wishes fill me up.
Waiting for him, I watch the moon.
Seeing me he said-Can I sit with you ?
I have sought you day and night-he said.
Then he loved me like the smoothing touch of moonlight.
Sun or moon - was I for him ?
But his presence-
His divine love
Ended my march for love.

We Must Overcome

Md. Hanirul Molla [B.A-1st year (H) ENGA, Roll-362]

Oh! the Drop of sea,Please,stop till coming me;
I am delaying in the mood of sleepness,
Thinking your kind and softness;
You give me new life thirsty men,
When he feels to die, then;
Oh ! My dear, please don't move more,
Kindly, stand still till I go to the shore;
But Alas ! When I need reached to the bank;
All of my requests have in vain,
Your nature is to move on, I failed again;
So, you don't hear me for a moment,
Have I now to spend in lanent ?
But I can't be hopeless for the next oppurtunities;

Then I never let you to go away,
I will grasp you by any way.....

The Stars

Saifuddin Molla [B.A-1st year (H) ENGA, Roll-932]

Behold in the sky the stars,
They are the farthest from the world,
We see them always gliter,
From the any part in the world.
To look at, they are very fine,
When we think them in our mind;
The moment we open our eyes high,
We find like a diamond in the sky.
The stars that often peer and always shine,
And twinkle also on the milky way,
Ever they make a endless line,
In the sky when we can them find.

The Governing Body Members

Monajat Dafadar
President

Dr. Nanigopal Barik
Secretary & Principal

MEMBERS

Sri Sunil Krishna Debnath	-	State Govt. Nominee
Manoara Begum	-	Panchyet Nominee
Dr. Ajay Mondal	-	Calcutta University Nominee
Prof. Partha Pratim Pal	-	Calcutta University Nominee
Prof. Luna Kayal	-	Teachers' Representative
Prof. Nanda Ghosh	-	Teachers' Representative
Dr. Nirupam Acharyya	-	Teachers' Representative
Prof. Ashis Biswas	-	Teachers' Representative
Abdur Rahim Baidya	-	Non-Teaching Representative
Md. Kuddus Ali	-	Non-Teaching Representative
Baharul Islam	-	General Secretary Students' Union

TEACHING STAFF

Principal
Dr. Nanigopal Barik

Department of Bengali
1. Dr. Nirupam Acharyya
2. Ajoy Majhi
3. Nafisa Parvin
4. Sharmistha Sadhu
5. Rajat Datta
6. Malay Kumar Pal

Department of Economics
1. Sanjukta Chakraborty
2. Dr. Tapan Banerjee

Department of English
1. Madhumita Majumdar
2. Safikul Islam
3. Abhijit Bhattacharjee
4. Jagabandhu Sarkar
5. Anwar Hossain
6. Raktim Gongopadhya

Department of Geography
1. Debjani De
2. Asish Biswas
3. Madhumita Chadraborty
4. Kakali Mollick
5. Priyanka Chatterjee

Department of Commerce
1. Subrata Goswami
2. Hemanta Mondal

Department of Education
1. Luna Kayal
2. Priyambada Ghosh Sarkar
3. Biplab Chakraborty
4. Amit Kumar Mondal

Department of History
1. Somnath Mandal
2. Soma Roy
3. Aparup Chakraborty
4. Swadhin Kumar Saha

Department of Mathematics
1. Dr. Nanigopal Barik
2. Dr. Shib Shankar Sana

Department of Philosophy
1. Nanda Ghosh
2. Samima Yasmin
3. Mainak Pal

Department of Political Science
1. Malika Sen
2. Mousumi Dasgupta
3. Arnab Dasgupta
4. Pradipta Mukherjee
5. Mitali Mallick

Department of Arabic
1. Mohabubar Rahaman
2. Md. Kutubuddin

Department of Library
1. Mosa Karim *(Library Asst.)*
2. Abdul Marup Molla
(Library Attendent.)

NON TEACHING STAFF

1.	**Abdur Rahim Baidya**	*(Accountant)*
2.	**Md. Kuddus Ali**	*(Cashier)*
3.	**Lalmia Molla**	*(Clerk)*
4.	**Tapash Kr. Debnath**	*(Clerk)*
5.	**Nityananda Mondal**	*(Typist)*
6.	**Nazrul Islam Molla**	*(Peon)*
7.	**Bimal Kumar Naskar**	*(Peon)*
8.	**Kamala Rani Sardar**	*(Lady Staff)*
9.	**Khayer Ali Molla**	*(Guard Staff)*
10.	**Rabeya Khatun**	*(Sweeper)*

CONTRACTUAL STAFF

1.	**Jahangir Siraj**	*(Office Staff)*
2.	**Ansar Ali Gazi**	*(Electrician)*
3.	**Jiban Sapui**	*(Gym-Instructor)*
4.	**Bhaskar Roy**	*(Gardener)*
5.	**Renuka Mondal**	*(Sweeper)*

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় ছাত্র সংসদ

২০০৬-২০০৭ কমিটি সদস্য

সভাপতি	-	ড: ননী গোপাল বারিক
সহ: সভাপতি	-	হাবিবুল ইসলাম
সম্পাদক	-	মো: বাহারুল ইসলাম (বাপ্পা)
সহ: সম্পাদক	-	ওয়াসিম হাবিব মল্লিক
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	-	সত্যজিৎ ঘোষ
ক্রীড়া সম্পাদক	-	মেহেবুব আলম
পত্রিকা সম্পাদিকা	-	উম্মেসালমা
ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক	-	কৃষানু মন্ডল
সদস্য	-	পিনাকী মন্ডল
সদস্য	-	মোঃ মনিরুল ইসলাম (মনি)
সদস্য	-	কুতুব উদ্দিন
সদস্য	-	নারগীস পারভীন
সদস্য	-	জাকির খান
সদস্য	-	ফারুক হোসেন
সদস্য	-	গৌতম মন্ডল
সদস্য	-	সালাউদ্দিন
সদস্য	-	আনছার আলি মোল্লা
সদস্য	-	বিজিত মাহাতো
সদস্য	-	গৌর মাহাতো
সদস্য	-	জাকির হোসেন
সদস্য	-	শুভঙ্কর রায়
সদস্য	-	বাপ্পা বৈদ্য
সদস্য	-	মোঃ মিলন হোসেন
সদস্য	-	হাফিজুল হক

সদস্য - শুভঙ্কর মন্ডল
সদস্য - সঞ্জয় মন্ডল
সদস্য - এস.কে. সারফরাজ
সদস্য - মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য - মিজানুর রহমান ঢালী
সদস্য - উর্মিলা মন্ডল
সদস্য - রুকসানা খাতুন
সদস্য - রুপালী খাতুন
সদস্য - সুচরিতা দাস
সদস্য - সামিম হাবিব
সদস্য - মোজাফ্ফার হোসেন
সদস্য - রবিউল ইসলাম
সদস্য - নাজমুল ইসলাম
সদস্য - মইনুল হাসান
সদস্য - রেজাউল হক মোল্লা
সদস্য - অসিত মাহাতো
সদস্য - আজাহার উদ্দিন মোল্লা
সদস্য - মধুসুদন বারুই
সদস্য - সৈকত রায়
সদস্য - আজিবর রহমান
সদস্য - সফিকুল ইসলাম
সদস্য - পুরঞ্জন মন্ডল
সদস্য - বিপ্লব দাস
সদস্য - বজলুর রহমান আকুঞ্জী
সদস্য - নাসিরুদ্দিন
সদস্য - বিশ্বজিৎ ঘোষ
সদস্য - হাসানুর জামান
সদস্য - মিজানুর হোসেন লস্কর

Seminar Room - Seminar on Women's Day

The members of the Students' Union

The Students' Union in the union room

The Library reading room

Rabindra Jayanti being marked

The Teaching staff with the students' Union